সম্পাদকীয়

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'রঙ্গ' কবিতায় লিখেছিলেন- 'জাদু, এ তো বড় রঙ্গ জাদু, এ তো বড় রঙ্গ।'

জাদু মানেই কি রঙ্গ? মজা? হাত সাফাইয়ের খেলা? আসলে যে আছে বিজ্ঞানের কৌশল। নবারুণ এবারের সংখ্যায় জাদু নিয়ে নানা রকমের আয়োজন করেছে। আশা করি রঙ্গ পাবে খুঁজে।

বাংলাদেশকে জাদুর কাঠির ছোঁয়ায় বদলে দিতে ১৯৮১ সালের ১৭ই মে তারিখে ফিরে এসেছিলেন আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই একটি মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ আজ বদলে গেছে। এই জাদু দেখে সারা বিশ্ব অবাক।

বিশ্বকবির কবিতা দিয়ে শুরু করেছিলাম। এই মাসে প্রিয় কবির জন্মবার্ষিকী। শ্রমিকের অধিকার নিয়ে সোচ্চার থাকা আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিনও আছে এই মাসে। প্রিয় দুই কবিকে স্মরণ করি আন্তরিক শ্রদ্ধার সাথে। সেই সাথে মহান মে দিবসের আদর্শ মনের মাঝে গেঁথে নিও তোমরা। শ্রমের মূল্য শ্রমিকের শরীরের ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার আগেই পরিশোধ করতে হয়।

সব জাদুর সেরা জাদু হচ্ছে মায়ের ভালোবাসা। আর তাই মা দিবস-কে স্মরণ করে বছরের প্রতিটি দিন যেন হয়ে ওঠে মা-কে ভালোবাসার দিন।

সূচি

নিবন্ধ

০৩ মেঘ কেঁদেছিল সেইদিন, আজ হাসছে কি?
তানিয়া খান

০৫ মে দিবস: শিশুশ্রম নিরসনে আমাদের দায়িত্ব
মেজবাউল হক

০৮ মধুর আমার মায়ের হাসি/ কাজী নুসরাত সুলতানা
১০ শিশুসাহিত্যে রবি ঠাকুর/ খায়রুল আলম রাজু
১২ নজরুলের সাঁতার শেখা/ রফিকুর রশীদ
১৬ হাতের লেখা সুন্দর চাইলে/ রূপন্তী রায়
১৭ অ্যামবিগ্রাম: এক 'দলছুট' শিল্প!
মো: মোরসালিন বিন কাশেম
৪০ ভাষা-দাদুর সঙ্গে: চন্দ্রবিন্দু কোথায় বসে?
তারিক মনজুর

৪২ বইয়ের রাজ্যে হইচই/ শামসুল হক আল আমজি
৪৪ বিজ্ঞানরম্য/ মো. সিরাজুল ইসলাম
৪৬ বাংলার রূপ আমি দেখিয়াছি/ ছবি- মোহাম্মদ সাজেদ
৪৭ গুগোল অনুসন্ধান কীভাবে কাজ করে?
সালমান শাহ আকবর শুভ

৫৩ কিশোরী ও প্রতিবন্ধীর কৃতিত্ব/ জান্নাতে রোজী
৫৫ কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দু মারিয়ানা ট্রেঞ্চ/ অনিক শুভ
৫৮ আগুন লাগলে কী করবে/শাহানা আফরোজ
৬০ সব বিভাগে হবে অটিজম পরিচর্যা কেন্দ্র
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

৬২ উচ্চতা বাড়াবে ব্যায়াম/ মো. জামাল উদ্দিন
৬৩ বুদ্ধিতে ধার দাও/ নাদিম মজিদ

সাক্ষাৎকার

৩৬ দ্যা গ্লোবাল হ্যাপিনেস চ্যালেঞ্জ

প্রধান সম্পাদক: মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন **সম্পাদক:** নাসরীন জাহান লিপি
সহ-সম্পাদক: শাহানা আফরোজ, মো. জামাল উদ্দিন, তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
সম্পাদকীয় সহযোগী: মেজবাউল হক, সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি
সহযোগী শিল্পনির্দেশক: সুবর্ণা শীল **অলংকরণ:** নাহ্‌রীন সুলতানা

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৩১১৮৫, **E-mail :** editornobarun@dfp.gov.bd, **ওয়েবসাইট:** www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ: সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ), চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৭৪৯০, **মূল্য:** ২০.০০ টাকা। **মুদ্রণ :** মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং, ১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

কবিতা

০৬ বাশার মাহফুজ/ আমিনুল ইসলাম কাইয়ূম
০৭ ফয়েজ রেজা/ রিপা তাসপিয়া নিশি
ইশরা হোসেন/ সাঈদ তপু
১১ ফরিদ আহমেদ হৃদয়/ সুজন সাজু
১৭ জেব-উন-নেসা জামাল
৪১ নূরে আলম ভূঁইয়া

জাদুর কবিতা

২৬ শেখ সালাহ্উদ্দীন/ এস এম তিতুমীর
৩৪ সাদিয়া নাজনীন প্রমা

গল্প

৪৯ মশা, ব্যাঙ, বক এবং তুতুল / দ্রানুপা আনজানা
৫১ কিল/ হাফিজ উদ্দীন আহমদ
৫২ একটি বট গাছের কথা/ নাসিম সুলতানা
৫৪ বন্ধুর জন্য/ মো. ফিরোজ খান

আঁকা ছবি

দ্বিতীয় প্রচ্ছদঃ জোহাইনা হায়দার/পৃথ্বী হাসান
শেষ প্রচ্ছদঃ বিন্দি পুষ্পিকা
০২ মাহী রহমান
০৬ সাকিব
৪৫ রুবামা সামাদ
৪৮ পড়শী চক্রবর্ত্তী পর্ণা
৫০ তাহমিদ আজমাঈন আহনাফ
৫৬ সহস্রাব্দী শাখাওয়াত
৬১ মো. সাজিদ

জাদুর নিবন্ধ

১৮ জাদুবিদ্যা : সেই থেকে আজ/ রাজীব বসাক
২৭ বিশ্বখ্যাত জাদুকর/ আহমদ স্বাধীন
৩৫ ঘরে বসেই জাদুকর হওয়ার সুযোগ
আফরোজা সুমি
৩০ বিজ্ঞানের জাদু/ শামস্ নূর
৫৭ থ্রি ডি প্রিন্টার যেন জাদু জানে!/ সাদিয়া ইফ্ফাত আঁখি

মা'কে ভালোবেসে ছবিটি এঁকেছে মাহী রহমান, ও পড়ে ভিকারুন নিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের একাদশ শ্রেণিতে।

নবারুণ পত্রিকার ফেসবুক পাতায় (Nobarun Potrika) আপলোডেড পত্রিকা পড়তে পারবে। এছাড়া চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dfp.gov.bd-এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে।

মোবাইলে নবারুণ পত্রিকা পড়তে চাইলে যে-কোনো স্মার্ট ফোনে গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে Nabarun লিখলেই নবারুণ মোবাইল অ্যাপ-এর আইকন আসবে। অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিলেই প্রতিটি সংখ্যা পড়তে পারবে একদম সহজে।

মেঘ কেঁদেছিল সেইদিন, আজ হাসছে কি?

তানিয়া খান

তারিখটার কথা খুব মনে পড়ছে আজ। ১৯৮১ সালের ১৭ই মে। আকাশে মেঘ ছিল, খুব বেশি মেঘ ছিল। ঘন কালো মেঘ, হুম হাম কড় কড় কড়াৎ করে ডেকে যাওয়া মেঘ। যেন খুব রাগ-অভিমান-দুঃখ ছিল মেঘের। কান্না শুরু করেছিল। গোমড়া মুখে মেঘের কান্না ভাসিয়ে দিচ্ছিল বাংলাদেশের পথঘাট।

এরকম মেঘলা দিনে কেউ ঘর থেকে বের হয় না। কবিগুরুর একটি কবিতা আছে, 'ওগো আজ তোরা যাস্ নে ঘরের বাহিরে।' এরকম মেঘলা দিন আসলে তেমনই, যাস্ নে ঘরের বাহিরে টাইপের। এরপরও কী আশ্চর্য দিন ছিল সেদিন। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার পথেঘাটে মানুষ বেরিয়ে এসেছিল। ভিজতে ভিজতে চলছিল বিমানবন্দরের দিকে। একটি বিশেষ বিমান নামবে। সেই বিমানে করে এসে বাংলার মাটিতে পা রাখবেন এক দুঃখিনী রাজকন্যা।

ঠিক তাই। বৃষ্টিভেজা আকাশকে সাক্ষী রেখে বিমান থেকে নেমে এলেন দুঃখিনী রাজকন্যা। মনে পড়ে যায় তার সব কথা। বিমানে চড়ে বিদেশে গিয়েছিলেন যখন, তখন তিনি দুঃখিনী ছিলেন না। ছিলেন সুখি রাজকন্যা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা এনে দেওয়া মহান নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বড়ো মেয়ে তিনি। নাম শেখ হাসিনা। বাবা পরম আদরে ডাকেন, হাসু! আহা! মেঘলা আকাশ গুমড়ে কেঁদে বলে, আর তো হাসু ডাক ডাকবেন না তিনি।

বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা আর শেখ রেহানা বিদেশে গিয়েছিলেন। দেশে থাকা বঙ্গবন্ধু এবং

তাঁর পরিবারের বাকি সবাইকে কী নির্মম ঘটনার শিকার হতে হয়, তা তো তোমরা জানো। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ভোর রাতে, আকাশে তখনো আলো ফোটেনি, মসজিদ থেকে ভেসে আসছিল ফজরের পবিত্র আজানের ধ্বনি। ঠিক সেই সময়, স্বাধীনতা যারা চায়নি, এই দেশের শত্রুরা দেশকে স্বাধীন করার শাস্তি দিতে গুলি চালালো বাংলাদেশের বুকেই। আর সেই গুলিতে শহিদ হলেন বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর পরিবারের সবাই।

বেঁচে রইলেন দুই রাজকন্যা। তবে তারা আর তখন সুখি রাজকন্যা নন। দঃখিনী রাজকন্যা। দুই রাজকন্যা দেশে আসতে চান। ঘাতকদের সমর্থনকারী সামরিক সরকার বাধা দেয়। তারা আসতে পারেন না। বিদেশে থেকেই বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদ করছিলেন দুই রাজকন্যা। দেশকে মুক্ত করার জন্য ছটফট করছিলেন নিজেরাই। বন্ধু রাষ্ট্রগুলো পাশে ছিল তাদের। অনেক চেষ্টার পর এল সেই দিন। ১৯৮১ সালের ১৭ই মে। শেখ হাসিনা ফিরতে পারলেন দেশে।

ফিরলেন তো, কিন্তু আর তো শুনবেন না 'হাসু' ডাক। আর তো জড়িয়ে ধরতে পারবেন না বাবা, মা, ভাই ও অন্য আত্মীয়দের। কষ্টের নদী অশ্রু হয়ে ঝরে।

সেই কষ্ট আকাশেরও ছিল। বাংলাদেশের সব মানুষেরও ছিল। উনিশশ একাত্তর সালে ত্রিশ লাখ শহিদের আত্মত্যাগ আর ২ লাখ নারীর আত্মসম্মানের বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীনতার যে-কোনো অর্থ ছিল না তখন। বাংলাদেশটা চলছিল পাকিস্তানের কায়দায়। কোথাও মুক্তিযুদ্ধের কথা বলা যায় না। বঙ্গবন্ধুর নাম কেউ উচ্চারণ করতে পারে না। সাধারণ মানুষদের অভাবের কথা কেউ শোনে না, কেউ ভাবে না তাদের কথা।

বঙ্গবন্ধু ভাবতেন। তিনি তো নেই। তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা ভাবছেন। তিনি এসে গেছেন। আবার সংগ্রাম শুরু হলো মানুষের। শেখ হাসিনার মাঝে তারা খুঁজে পেল বঙ্গবন্ধুকে। শেখ হাসিনার আহবানে সাড়া দিয়ে মানুষ আবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করল। শুরু হলো প্রতিরোধ।

অনেক দিনের কষ্টের পর অবশেষে শেখ হাসিনার হাতে বাংলাদেশ শাসনের ভার এসেছিল। এরপর থেকে বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে সোনালি পাখির ডানায় চড়ে উন্নতির পথে। তোমরা সেই সোনালি সময়টাকে দেখতে পাচ্ছ। এসব কষ্টের ইতিহাস তোমাদের বাবা-মা, মুরব্বিরা জানেন। তোমরা জেনে নিও তাদের থেকে। আর এই নতুন বাংলাদেশকে ভালোবাসবে। এই দেশ যেন আর কখনো শত্রুর কবলে না পড়তে পারে, তার জন্য সচেতন থেকো। বাংলাদেশের নতুন যুগের নতুন সৈনিক তো তোমরাই।

তোমাদের কথা ভেবেই দেখ সূর্যটা হাসছে। বুকের ভেতর হারানোর কষ্ট আছে এখনো। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতাকে হারিয়ে ফেলার কষ্ট মুছবে না কোনোদিন। কিন্তু সেই শোককে শক্তিতে পরিণত করে বাংলাদেশ যে আবারো উঠে দাঁড়াতে পারল, এই আনন্দে ঝলমল করে হাসছে সূর্যটা। আলো ছড়াচ্ছে বিশ্বময়। ■

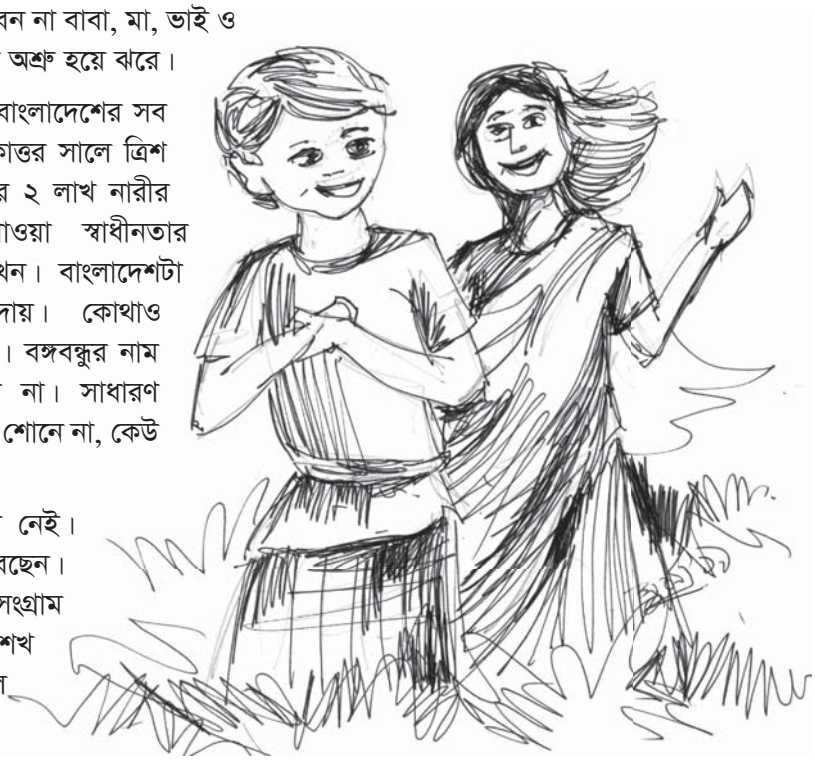

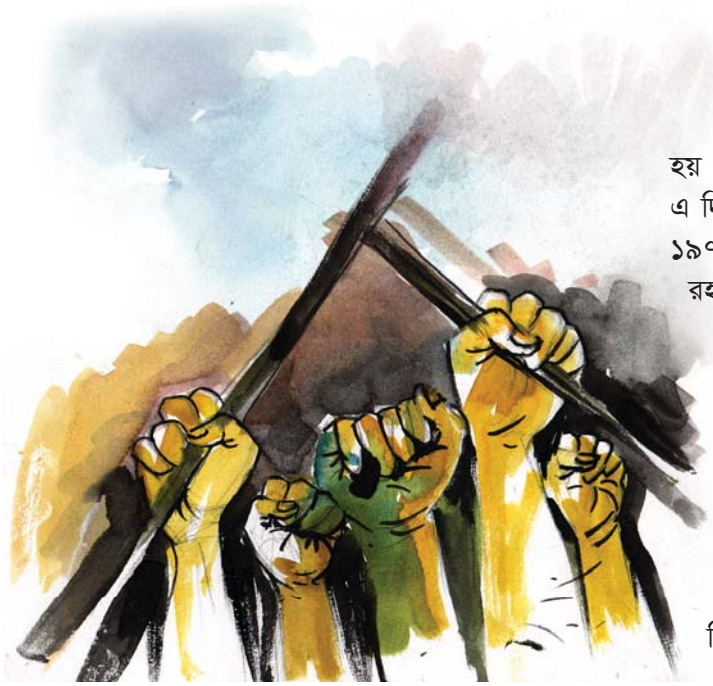

মে দিবস: শিশুশ্রম নিরসনে আমাদের দায়িত্ব

মেজবাউল হক

বন্ধুরা, তোমরা তো জানো ১ লা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস। যাকে আমরা মে দিবস হিসেবে জানি। প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী এদিনটি উদযাপিত হয়। বিশ্বের প্রায় ৮০টি দেশে ১লা মে জাতীয় ছুটির দিন। বিশ্বের আরো অনেক দেশে এটি বেসরকারিভাবে পালিত হয়ে আসছে।

১৮৮৬ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটের ম্যাসাকার শহিদদের আত্মত্যাগের স্মরণে এ দিবসটি পালিত হয়। ১৮৮৬ সালে কর্মঘণ্টা ৮ ঘণ্টার দাবিতে শহিদ হয় এই শ্রমিকরা। পরবর্তীতে ১৮৮৯ সালের ১৪ই জুলাই ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে স্বীকৃতি দেওয়া হয় ১লা মে শিকাগোর শ্রমিকদের রক্তদানকে। তখন থেকে বিশ্বে পালিত হয় মে দিবস।

আমেরিকার সেই শ্রমিকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রতিবছর ১লা মে নানা কর্মসূচির মাধ্যমে পালিত হয় এ দিবসটি। তুলে ধরা হয় জনসাধারণের কাছে এ দিবসের মূল চেতনা। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মে দিবসকে সরকারি ছুটি হিসেবে ঘোষণা করেন। শ্রমিক অধিকারকে সংরক্ষণ করার জন্য আমাদের সরকার বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধন-২০১৩) প্রণয়ন করেছে। এ আইনের ৩৪ ধারায় বলা হয়েছে, কোনো পেশায় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো শিশু ও কিশোরকে নিয়োগ করা যাবে না বা কাজ করতে দেওয়া যাবে না।

আর এদিনটি এলেই বেশি আলোচিত হয় শিশুশ্রম নিয়ে। আমাদের দেশের কলকারখানার কিছু মালিক আছেন যারা কম পয়সায় বেশি মুনাফা ভোগ করতে চান। বেশি বেতন দেওয়ার ভয়ে বড়োদের কাজে লাগান না। সেই সব স্থানে শিশুদের কাজে লাগান। ফলে শিশুরাও না বুঝে অল্প বয়সে শিশুশ্রম তথা নানা ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় কাজ করেন। এই শিশুশ্রম নিরসনে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এ নির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে, ১৪ বছরের নিচে কোনো শিশুকে কাজে নেওয়া যাবে না। ১৪ থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত কাজে নেওয়া যাবে, তবে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নেওয়া যাবে না। এছাড়া শিশুশ্রম নিরসনে জাতিসংঘ প্রণীত সব সনদে সরকার অনুস্বাক্ষর করেছে।

শিশুশ্রম নিরসনে বা শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে ফিরিয়ে আনতে বর্তমান সরকার নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করছে। রেডিও, টেলিভিশন, পত্রপত্রিকায় সচেতনতামূলক প্রচার প্রচারণা চালানো, শিশুদের কাজে না লাগানোর জন্য মালিককের নিষেধ করা, যেসব শিশু-কিশোর এ সব ঝুঁকিপূর্ণ কাজে আসেন তাদেরকে বুঝানোসহ প্রভৃতি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে কাজ করছে বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও। এছাড়া সরকারের পাশাপাশি আমাদেরও এ ব্যাপারে দায়িত্ব নিতে হবে। সরকারের পক্ষে একা শিশুশ্রম বন্ধ করা যাবে না। এজন্য জনসচেতনতা তৈরি করতে হবে। তবেই দেশ হবে শিশুশ্রম মুক্ত। ■

কবিতার হাট

আমি কি আর ছোটো

বাশার মাহফুজ

অনেক কিছুই করতে পারি তবু কোনো নাম নেই
আশেপাশের সবাই বড়ো আমার কোনো দাম নেই!
দ্বিতীয় শ্রেণি পড়ছি তবু সবাই বলে ছোট্ট খোকা
তাদের দেখে অবাক চোখে মুখের ভেতর ঢুকছে পোকা।

গুণে গুণে দু-মাস হলো দাঁত উঠেছে ছয়
এখন আমি অনেক বড়ো পাই না কোনো ভয়।
মায়ে তবু ভয় দেখাতে ভূতের কথা বলে
ভূতরা নাকি লম্বা পায়ে গভীর রাতে চলে!

মামা এসে হাতটা ধরে রাস্তা করে পার
এসব দেখে মনের ভেতর ভালো লাগে না আর।
মজার ছড়া একা একাই পড়তে পারি বইয়ের পাতায়
ফড়িং পোকা ব্যাঙের ছানা আঁকতে পারি আঁকার খাতায়।

শিমুল ডালে পাতার ফাঁকে ঘুঘু পাখির ডাকটা
দূরের দেশে বয়ে চলা চিত্রা নদীর বাঁকটা
বিকালবেলা একা একাই ঘুরে ফিরে মনটা তাজা
দোকান থেকে কিনতে পারি লাঠি লজেন্স বাদাম ভাজা।

আরো পারি অনেক কিছুই সবাই তবু ছোটো বলে
বড়ো ভাইয়া বড়ো আপু নেয় না কেন তাদের দলে!
সবাই আমায় বললে ছোটো আমি কি আর ছোটো
মানটা ভেঙে হাসলে আমি গোলাপ তুমি ফোটো।

দেশি ফলের অনেক গুণ

আমিনুল ইসলাম কাইয়ূম

শুনে রেখো ভাইবোন,
'দেশি ফলের' অনেক গুণ।
জুড়ি নেই তার শুনে নিন,
স্বাদে ও গন্ধে তুলনাহীন।
পুষ্টি দেহের শক্তি বাড়ায়,
রোগ-শোককে দূরে তাড়ায়।
ভাই-বোনেরা খাও ফল
বিশুদ্ধ ফল খাবার ফলে,
দুঃখ-কষ্ট যাবেই চলে,
ভালো রবে দেহের কল।

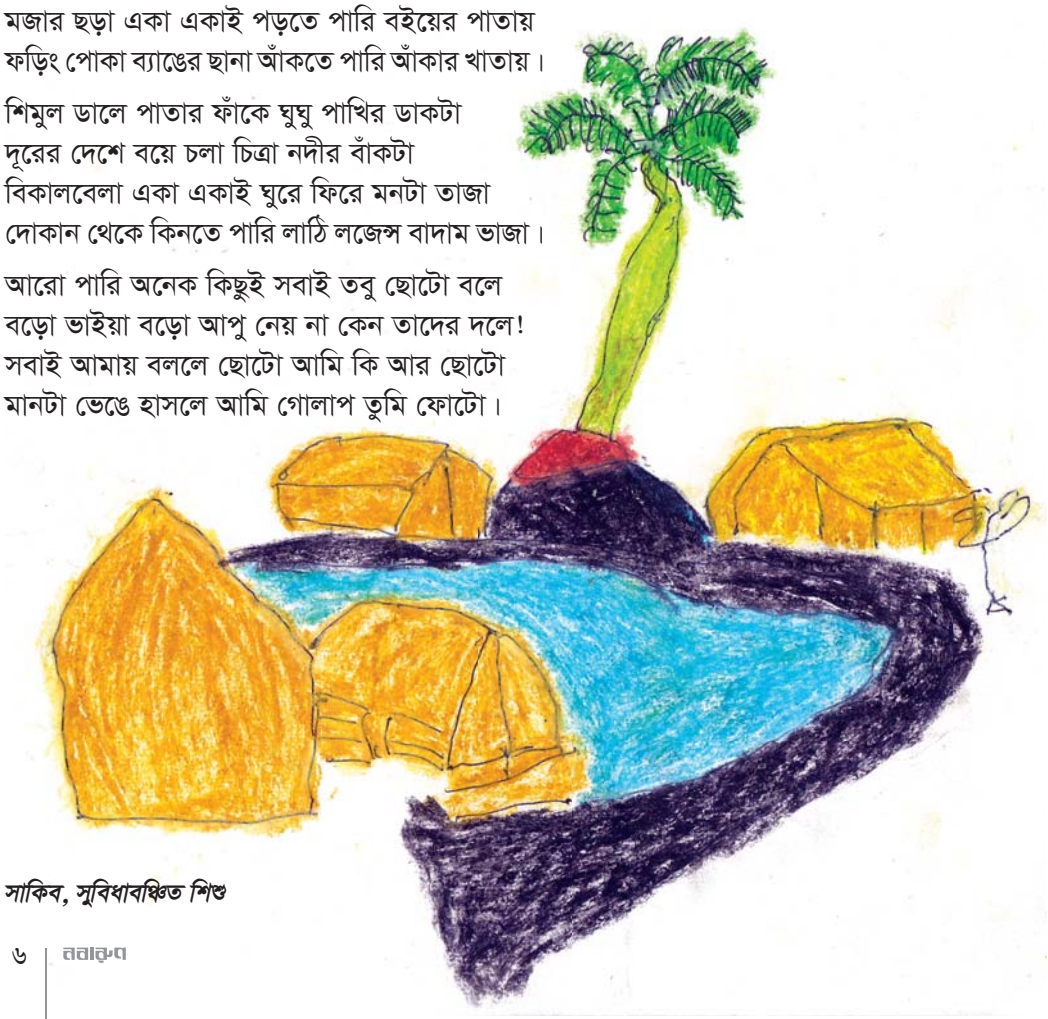

সাকিব, সুবিধাবঞ্চিত শিশু

পাখির মতো মা

ফয়েজ রেজা

আমি আমার মাকে যখন
আম্মু বলে ডাকি
যখন মায়ের মুখের দিকে
অবাক চেয়ে থাকি।
আম্মু তখন আলতো করে
আমাকে দেয় ঝাঁকি
আদর সুখে আমি মায়ের
আঁচলে মুখ ঢাকি।
আঁচলে মুখ ঢেকে মনে
মায়ের ছবি আঁকি
ছবির মা টা পাখির মতো
বুঝতে পারে মা কী?

বদ্ধভূমি

ইশরা হোসেন

এদেশের বদ্ধভূমি
হাজারো স্মৃতির স্মৃতিকথা।
এদেশের বদ্ধভূমি
রক্তে রঞ্জিত অনেক প্রাণ।
এদেশের বদ্ধভূমি
শত মায়ের অশ্রুজল।
এদেশের বদ্ধভূমি
লক্ষ বোনের সম্মানহানি
এদেশের বদ্ধভূমি
হাজারো বাবার বুক খালি
এদেশের বদ্ধভূমি
লাখো বীর শহিদের নাম।
এদেশের বদ্ধভূমি
শত কষ্টের বিনিময়ে
স্বাধীন বাংলাদেশ।

একাদশ শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল শাখা।

মা

রিপা তাসপিয়া নিশি

মা কথাটি এত মধুর
লাগে অনেক ভালো
মা যে আমার চলার পথের
দুই নয়নের আলো।

এই ভূবনে মায়ের মতো
নাই যে কেউ একজন
মা যে আমার সবার থেকে
প্রিয় আপনজন।

দশম শ্রেণি, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল, ঢাকা।

মা যে এখন

সাঈদ তপু

মা যে এখন আমায় ছেড়ে
অনেক দূরে
ডাকে না আর আদর করে
ছোট্ট খোকা
বলে না তো ঝাঁপ দিয়ে আয়
মিষ্টি সুরে
কোথায় গেলি ওরে আমার
জোনাক পোকা
তুই যে আমার আঁধার দ্বীপে
আলোর কুপি
ঘুমোস যখন আদর করি
চুপি চুপি
পারবে না কেউ দিতে তোরে
ফুলের টোকা
সেই মা আমার বানিয়ে গেল
আমায় বোকা
সেই যে গেল; খুঁজে ফিরি
আর আসে না
মায়ের মতো ভালো আমায়
কেউ বাসে না!

নিবন্ধ

মধুর আমার মায়ের হাসি

কাজী নুসরাত সুলতানা

আমি ছোটোবেলায় যেসব জায়গায় থেকেছি সেসব জায়গায় প্রচুর গাছগাছালি ছিল। আর সেসব গাছগাছালিতে ছিল নানা ধরনের পাখি আর তাদের বাসা। সে সময় একটা ব্যাপার দেখে খুব মজা পেতাম। দেখতাম এক একটা পাখির বাসায় কতগুলো ছোটো ছোটো পাখি জোরে জোরে চেঁচামেচি করছে। আর কিছুক্ষণ পরে পরে একটা করে বড়ো পাখি উড়ে এসে ছোটো পাখিগুলোর মুখের মধ্যে ঠোঁট ঢুকিয়ে দিয়ে আবার চলে যাচ্ছে।

একটু বড়ো হয়ে জেনেছিলাম বড়ো পাখিগুলো মা আর বাবা পাখি এবং ছোটো পাখিগুলো তাদের ছানাপোনা। আর ঐ যে বড়ো পাখির ছোটো পাখির মুখের ভেতর ঠোঁট ঢুকিয়ে দেওয়া সেটা একটা বিশেষ কাজ মা-পাখির। কাজটা যে কী সেটা হয়ত তুমি জানো। তবে অনেকে জানে না তাই খুলেই বলি।

পাখিরা যে খাবার খায় তা তারা খাবারের কাছে উড়ে গিয়ে তাদের ঠোঁট দিয়ে খুঁটে খুঁটে তুলে নেয়, কিন্তু বাচ্চা পাখিরা বেশ একটু বড়ো না হওয়া পর্যন্ত উড়তেও পারে না, খুঁটতেও পারে না। ঐ সময়টাতে মাপাখি খাবার ঠোঁটে করে নিয়ে বাসায় এসে বাচ্চা পাখির মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়।

মাপাখি আরো একটা কাজ করে। সেটা হলো খাবারটুকুকে তার মুখের ভেতরের লালার সঙ্গে মিশিয়ে একটু চিবানোর মতো করে নরম করে নেয়। এতে বাচ্চা পাখির খেতে আর হজম করতে সুবিধা হয়।

নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ মাপাখি তার ছানাপোনাদের কত আদর আর যত্ন করে! শুধু পাখি মা নয়, মুরগি মাকেও মনে হয় দেখেছ ককক করে ডেকে কেমন সুন্দর করে তার ছানাদের খেতে শেখায়। আরো একটা কাজ মুরগি মাকে করতে হয়। মুরগি মাতো তার ছানাদের নিয়ে উঠানে বা মাঠের খোলা জায়গায় ঘুরে ঘুরে খাবার খাওয়ায়! আর ওদিকে আকাশে উড়ে উড়ে কাক আর শকুন সুযোগ খুঁজতে থাকে কখন ছোঁ মেরে ছানাদেরকে নিয়ে যাবে। মা পাখি ঠিক টের পায় কখন ওরা আসছে। তখন মা পাখি একটা অন্য রকম ককক শব্দ করে আর ছানাগুলো ছুটে মায়ের ডানার নিচে চলে আসে। মা তার ডানা দিয়ে জাপটে ধরে আড়াল করে রাখে ছানাদের। একটু বড়ো হয়ে গেলে আর দরকার হয় না; ওরা নিজেরাই নিজেদেরকে বাঁচিয়ে নিতে পারে ঝোপঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে গিয়ে।

বেড়ালমাকে কখনো দেখেছ মুখ দিয়ে তার ছানার ঘাড়ের খানিকটা মাংসে ধরে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে? ওরা ওরকম করে যাতে বাচ্চাদের কেউ খুঁজে না পায়, তারা আরো নিরাপদ থাকে। পাখির ছানাকে তো উড়তেও শেখাতে হয়, বেড়াল ছানাকে দেখতে শেখাতে হয় তার চোখ ফুটিয়ে দিয়ে।

এবারে আমাদের মায়েদের কথা ভাবো তো! আমাদের মায়েরাও আমাদের অনেক যত্ন করেন। কেমন করে? বলছি শোনো।

তোমার ছোট্ট ভাই বা বোন যখন প্রথম পৃথিবীতে এল তখন দেখেছ তো প্রথম কয়েকটা মাস সে শুয়েই কাটায়, হাত-পা নাড়ে আর খিদে পেলে কাঁদে। এ সময় তার সব কাজ মাকেই করে দিতে হয়। অনেক সময় মাকে রাত জেগেও তার দেখাশোনা করতে হয়। এতে মায়ের কষ্ট হলেও আনন্দও হয় অনেক। কারণ বাবুটা যে তাঁর আদরের ধন!

যখন তার এক বছর বয়স হয় তখন সে হাঁটতে শিখে যায়। কিন্তু তখনো তাকে খাইয়ে দিতে হয়, পরিষ্কার করিয়ে দিতে হয়, হাঁটতে গিয়ে পড়ে যেন ব্যথা না পায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হয়। যখন আরো একটু বড়ো হয়, স্কুলে যাবার বয়সে তাকে তৈরি করে দিতে হয়। স্কুলে নিয়ে যাওয়া-আসা করা, পড়া শিখতে সাহায্য করতে হয়, আর রান্না করে খাওয়ানো তো আছেই। মায়েদের এ রকম কষ্ট চলতেই থাকে।

আমাদের মায়েদের আরো একটা খুব কঠিন কাজ করতে হয়, সেটা হলো কী করলে আমাদের ভালো হবে, কী করলে ভালো হবে না সেগুলো বুঝিয়ে দেওয়া, শিখে নিতে সাহায্য করা। এই শেখাটাই আমাদের জীবনে বড়ো হতে, জীবনকে সুন্দরভাবে চালিয়ে নিতে সাহায্য করে। এই যে আমাকে ভালোমন্দ বুঝতে সাহায্য করা এটা হলো সত্যিকার অর্থে মানুষ করা। এ বড়ো সহজ কাজ নয়! কারণ তুমি তো বোঝো যে আমাকে কিছু বললেই আমি শুনব আর মানব তেমনটা নয়। যেমন ধরো ভালো কাজের একটা উদাহরণ হলো সত্যি কথা বলা। মা বলেছেন, 'সব সময় সত্যি কথা বলবে, মিথ্যে কথা বলা উচিত নয়।' একদিন হঠাৎ আমার হাত থেকে পড়ে মায়ের একটা শখের কাচের গ্লাস ভেঙে গেল। যেহেতু কেউ দেখেনি তাই মা যখন জিজ্ঞেস করলেন, 'কে ভেঙেছে আমার গ্লাসটা?' আমি কিছু বললাম না। ফলে স্বাভাবিকভাবেই রান্নাঘরে যিনি কাজে সাহায্য করেন সেই খালার উপর সন্দেহটা পড়ল। খালা রাগ করে কাজ ছেড়ে চলে যেতে চাইলেন। তখন আমি আসল কথাটা বলেই ফেললাম। মা বকলেন না, শুধু বুঝিয়ে বললেন যে অনিচ্ছায় ভুল বা দোষ হয়ে যাওয়াটা দোষের নয়, কিন্তু সেটা লুকিয়ে রেখে সমস্যা তৈরি করাটা দোষের।

মা যেভাবে সুন্দর করে বুঝিয়ে বললেন তাতে আমার মনে হয় না যে, আমি আর সত্য গোপন করার মতো দোষ করব। কিন্তু এভাবে বুঝিয়ে বলতেও মায়েদের কষ্ট করতে হয়; অনেক জ্ঞান অর্জন করতে হয়, অনেক ধৈর্য ধরতে হয়। তবে আমি বুঝি যে এ রকম কষ্ট করতে মায়ের একটুও খারাপ লাগে না। আমার জন্য কাজ করার সময় আমি তো দেখি মায়ের মুখে হাসিই থাকে। মা যে আমায় ভালোবাসেন!

আমাদেরও তো মাকে ছাড়া চলে না মোটেও, তাই না? আমাদের তো সব সময় মায়ের কাছে কাছে থাকতে ভালো লাগে। আমরা তো সব ব্যাপারে মায়ের উপর নির্ভর করি। আমাদের যত আবদার, যত প্রশ্ন, যত ইচ্ছের কথা সব মায়ের কাছে করি বা বলি। মাও সেগুলো পূরণ করার, উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন সব সময়। আমরাও মাকে খুব ভালোবাসি। আর তাই তো মায়ের কথামতো কাজ করে মায়ের মুখে মধুর হাসি ধরে রাখার চেষ্টা করি। ■

নিবন্ধ

শিশুসাহিত্যে রবি ঠাকুর

খায়রুল আলম রাজু

১
মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে।
তুমি যাচ্ছ পালকিতে মা চড়ে
দরজা দুটো একটুকু ফাঁক করে,...

২
তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে
সব গাছ ছাড়িয়ে
উঁকি মারে আকাশে।
মনে সাধ, কালো মেঘ ফুঁড়ে যায়,
একেবারে উড়ে যায়
কোথা পাবে পাখা সে!...

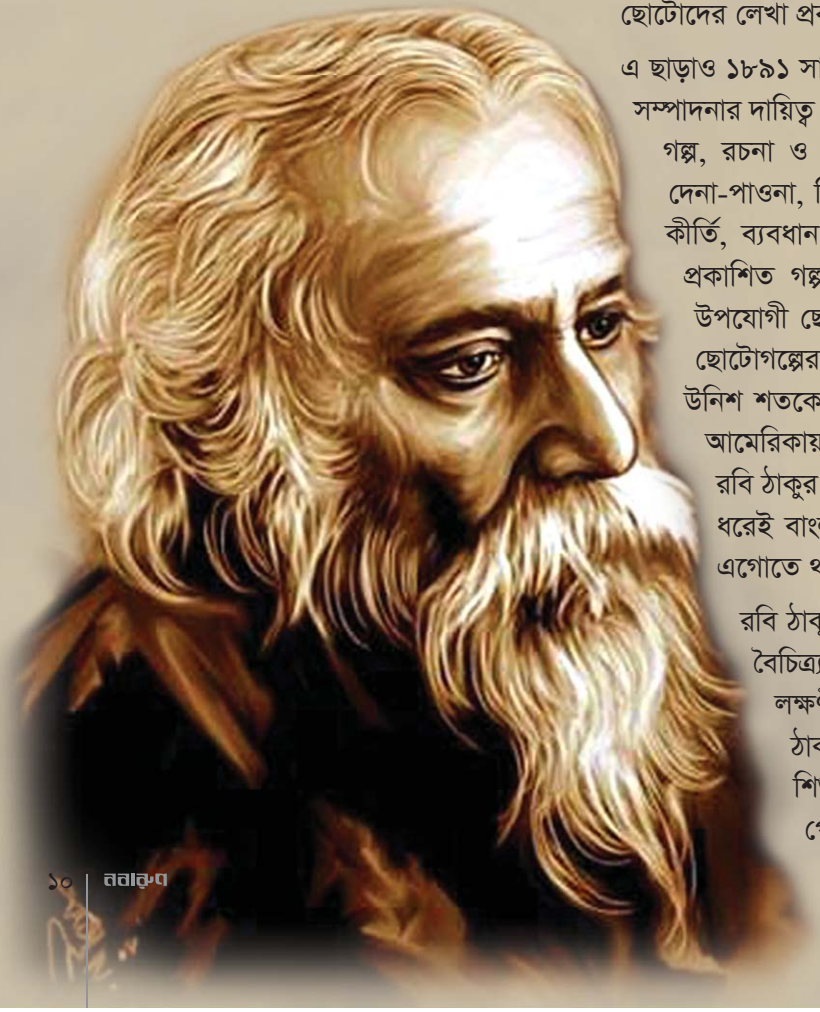

ছোট্ট বন্ধুরা, ছড়া দুটো আমরা সবাই পড়েছি, সেই ছোট্টবেলায়। তাই না?

তবে হ্যাঁ, পাঠ্যবই-এ ছড়া দুটো এখনো আছে। আর থাকবেও। তোমরা জানো তো ছড়া দুটো কার লেখা?

অবশ্যই জানার কথা। কেননা রবি ঠাকুরকে চিনে না এমন কাউকে পাওয়া দুষ্কর। হ্যাঁ, আমি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথাই বলছি। ছোটোদের, বড়োদের, আমাদের তথা সারা বিশ্বের কবি। শিশু মনে লুকিয়ে থাকা এক কল্পনা জগৎ খুঁজতে নিজেই শিশু বনেছেন। ছোটোদের কথা মাথায় রেখে লিখেছেন শিশুতোষ ছড়া-কবিতা, নাটক ও ছোটোগল্প। শিশুদের নিয়ে লেখা তাঁর বইগুলো যথাক্রমে, সহজপাঠ-১, সহজপাঠ-২, খাপছাড়া, ছড়া ও ছবি, গল্পস্বল্প, ছড়া, ছেলেবেলা, বিশ্বপরিচয়, লিপিকা, মুকুট প্রভৃতি। পাশাপাশি সোনারতরী, কাহিনি, কড়ি ও কোমল, চিত্রা, ক্ষণিকা, কল্পনা বইগুলোতেও বেশ কয়েকটি ছোটোদের লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

এ ছাড়াও ১৮৯১ সালে সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পেয়ে রবীন্দ্রনাথ ছয় সপ্তাহে ছয়টি গল্প, রচনা ও প্রকাশ করেন। গল্পগুলো হলো- দেনা-পাওনা, গিন্নি, পোস্টমাস্টার, তারাপ্রসন্নের কীর্তি, ব্যবধান এবং রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা। প্রকাশিত গল্পগুলোর ধরন ছিল শিশু-কিশোর উপযোগী ছোটোগল্প। তিনিই বাংলা সাহিত্যে ছোটোগল্পের জনক। কেননা তখনকার সময়ে, উনিশ শতকে এসে এশিয়া, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় যে কজন ছোটোগল্প লিখতেন রবি ঠাকুর তাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর হাত ধরেই বাংলা ছোটোগল্প হাঁটি হাঁটি পা করে এগোতে থাকে।

রবি ঠাকুরের ছোটোগল্পে ষড়ঋতুর লীলা-বৈচিত্র্য, গ্রামবাংলার অপরূপ সৌন্দর্য লক্ষণীয়। ছোটোগল্পের মাধ্যমে রবি ঠাকুর সুনিপুণভাবে অঙ্কন করেছেন শিশু চরিত্র। কাবুলিওয়ালা, পোস্টমাস্টার, ছুটি, বলাই,

ইচ্ছেপূরণ প্রভৃতি গল্প এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। এক কথায়, রবি ঠাকুরের রচনাবলির উল্লেখযোগ্য অংশই শিশুতোষ। আমাদের ছোট নদী, নতুন দেশ, তালগাছ, মাঝি, বীরপুরুষ, অকর্মার বিভ্রাট ইত্যাদি তার বাস্তব প্রমাণ।

রবি ঠাকুরের শিশুসাহিত্য নিয়ে লেখার পিছনে আছে এক করুণ রহস্য! তা হলো, শৈশবে মাকে হারানোর পর অন্তরের করুণ হাহাকার নতুন করে অনুভব করেন নিজের মাতৃহারা সন্তানদের দেখে। তখনি তাদের নানাভাবে সান্ত্বনা দিতে তিনি রচনা করেন, 'শিশু সাহিত্যের' জগৎ। ছন্দের নন্দিত ঝংকারে কবি প্রকাশ করেছেন ছোটোদের কল্পনা জগতের নানান ভাবনা-ইচ্ছা মাঝি হওয়ার সাধ, পাখির মতো উড়ার স্বপ্ন, অজানা দেশের প্রতি শিশু মনের ভাবনা। 'নতুন দেশ' ছড়া-কবিতাটিতে কবি তা বলেছেন,

নদীর ঘাটের কাছে
নৌকো বাঁধা আছে
নাইতে যখন যাই, দেখি সে
জলের ঢেউয়ে নাচে।...
.....

কত রাতের শেষে
নৌকো যে যায় ভেসে।
বাবা কেন আপিসে যায়,
যায় না নতুন দেশে?

এমনি মজার মজার শিক্ষণীয় ছড়া-কবিতা লিখে রবি ঠাকুর সমৃদ্ধ করেছেন আমাদের শিশুসাহিত্য। প্রতিভাবান এই কবিগুরু ২৫শে বৈশাখ, ১২৬৮ (৭ই মে ১৮৬১) কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। একাধারে তিনি ছিলেন, কবি-ঔপন্যাসিক, নাট্যকার-প্রাবন্ধিক, দার্শনিক-সংগীতজ্ঞ, চিত্রশিল্পী, গল্পকার এবং শিশুসাহিত্যিক। তারপর ৮০ বছর বয়সে ২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ, (৭ই আগস্ট ১৯৪১ সালে) না ফেরার দেশে চলে যান কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তবুও কবি চির অমর হয়ে আছেন তাঁর রচিত সৃষ্টিকর্মে। ■

দ্বাদশ শ্রেণি, জনাব আলী সরকারি কলেজ, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ

কবিতা

নজরুল

ফরিদ আহমেদ হৃদয়

নীতির কবি
প্রীতির কবি
তাঁর মতো নাই দ্বিতীয়
লিখতেন ছড়া গীতিও
চলে গিয়ে রেখে গেছেন স্মৃতিও।
সাম্যের কবি
ন্যায়ের কবি
লিখতেন তিনি গজলও
পেতেন আল্লার ফজলও
তাই তো তিনি হয়েছিলেন সফলও।

অন্তরে তার আসন

সুজন সাজু

লিখতেন তিনি কবিতা গান মানবতার কথা,
প্রতিবাদী তাঁর লেখনী মানব বিরোধ যেথা।
যেই যেখানে কমতি ছিল মূল্যবোধের অভাব,
চেষ্টা ছিল জাগিয়ে তোলা আদর প্রীতির স্বভাব।
কাব্য-গানে নাটক ছবি সব শাখাতে স্থির,
তিনি হলেন রবি ঠাকুর, কবির বিশ্বে বীর।
কেউ নয়তো এমন কবি, বিশ্বকবির মতো,
যাঁর ভিতরে করত বসত মানব কল্যাণ ব্রত।
তাই তো তিনি আজও আছেন অন্তর সুধা ঘ্রাণে,
উচ্ছ্বাসে বেশ হৃদয় নাচে সৃষ্টি সেরার টানে।
থাকবেন বেঁচে সৃষ্টিতে সেই যশ খ্যাতির শীর্ষে,
অন্তরে তাঁর আসন আজি কবির গুরু বিশ্বে।

নিবন্ধ

নজরুলের সাঁতার শেখা

রফিকুর রশীদ

রানীগঞ্জ কয়লা কুঠির দেশ। এখানকার মাটির রং তামাটে রুক্ষ। গরমকালে এমন বিদঘুটে গরম পড়ে যে গায়ের চামড়ায় ফোসকা পড়ার দশা হয়। আমবাগানের ছায়ায় বসে শরীর জুড়ায়। তবু সবসময় ইচ্ছে করে পুকুরে নেমে ঠান্ডা হতে। পুকুরের জলে নামলেই মন হয়ে যায় অন্যরকম। বাড়ি ফেরার কথা মনেই থাকে না। বিশেষ করে শিশু-কিশোররা তো একবার পুকুরে নামলে আর উঠতেই চায় না। ডাঙার চেয়ে জলেই যেন অধিক আনন্দ। পুকুরের জলে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে হাপুস-হুপুস করা, সাঁতার কেটে এপার ওপার করা, ডুব দিয়ে দিয়ে চোখ লাল করে ফেলা, দীর্ঘ সময় ভিজে ভিজে হাত-পায়ের আঙুল চুপসে যাওয়া, তারপর সেই গরমের দিনেও সারা গায়ে শীত শীত লাগবে তখন পুকুর থেকে উঠে আসা এসব হচ্ছে নিত্যদিনের রুটিন।

মর্নিং স্কুল হবার পর থেকে রায়বাহাদুরের নাতি শৈলজা তো প্রায় প্রতিদিন এই কাজই করে। স্কুল থেকে এসেই দে ছুট ম্যানেজার পুকুরে। কী যে নিকষ কালো টলটলে জল। শানবাঁধানো ঘাটে এসে দাঁড়াতেই উতলা হয়ে ওঠে মন কখন ঝাঁপিয়ে পড়ব জলে। অনতিদূরে ফুটে আছে লাল পদ্ম-নীল পদ্ম। তারা হাতছানিতে ডাকছে আয়, খোকা আয়। এই পুকুরের নাম কেন যে হয়েছে ম্যানেজার পুকুর শৈলজা সে কথা জানে না। থাকে সে মামাবাড়ি। নানারকম শাসন বারণ আছে, তবু সে সুযোগ পেলেই ছুটে যায় সেই বিশাল পুকুরে, অগাধ জলে হাত-পা মেলে দাপাদাপি করে, তখন মনে হয় আহা! কী আনন্দ!

ম্যানেজার পুকুরের খুব কাছেই শৈলজার বন্ধু নজরুলের আস্তানা। নজরুল মানে কাজী নজরুল, চুরুলিয়ার ছেলে, শিয়ারসোল রাজ স্কুলের ছাত্র, থাকে মুসলিম বোর্ডিং-এ। শৈলজার সঙ্গে গলায় গলায় ভাব। তারা লেখাপড়া করে দুটি পৃথক স্কুলে কিন্তু অন্তরে অন্তরে এক ও অভিন্ন। রাতের ঘুম আর স্কুলের সময়টুকু বাদ দিলে বাকি সময় দুই বন্ধু থাকে এক সঙ্গে। খেলাধুলা আনন্দ-ফুর্তি হইহল্লা, মাতামাতি। সব সময়ের সঙ্গী নজরুল। শৈলজার খুব দুঃখ প্রাণের বন্ধু নজরুল কিছুতেই পুকুরে নামতে চায় না। তাকে পুকুরে স্নান করার কথা বললেই সে ফিক ফিক করে হাসে, আবার কখনো বা উলটো যুক্তি দেখায়। আমাদের কুয়োর জল কী রকম ঠান্ডা জানো!

মুসলিম বোর্ডিং-এর উঠোনে যে পাতকুয়ো আছে, নজরুল প্রতিদিন সেই কুয়োর জলে স্নান করে, তাই সে কুয়োর জলের প্রশংসা করে, আহ, একেবারে বরফ দেওয়া জলের মতো।

শৈলজাকে জিভ ভ্যাংচায়,বলেছে তোমাকে !

নজরুলও খুব জোর দেয়, হ্যাঁ, দু-বালতি ঢাললেই গা জুড়িয়ে শীতল।

শৈলজা রাগিয়ে দেওয়ার জন্যে বন্ধুকে বলে, কুয়োর ব্যাঙ, কাকে বলে জানো তো।

মুখ ভার করে নজরুল বলে, তুমি আমাকে কুয়োর ব্যাঙ বললে?

নাহ, তোমাকে বলিনি তো।

নজরুলের মুখে কথা নেই। গম্ভীর। দেখেশুনে শৈলজা ব্যাকুল হয়ে ওঠে আহা, তুমি তো ইচ্ছে করলে নদীতেও নামতে পারো, পুকুরেও নামতে পারো, বলো পারো না?

পুকুরে বা নদীতে নামতে মোটেই রাজি নয় নজরুল। কিন্তু এ রকম কৌশল খাটিয়ে প্রশ্ন করা হলে তখন সে কী জবাব দেবে। সহসা নজরুলের মুখে উত্তর জোগায় না। তখন বন্ধুর পিঠে হাত রেখে শৈলজা প্রস্তাব দেয়, তারচেয়ে চলো যাই আমরা দুজনেই পুকুরের ব্যাঙ

হই। আমাদের ওই ম্যানেজার পুকুরে সাঁতার কাটি, এপার- ওপার করি।

নজরুল গাঁইগুঁই করে বলে, যা-ই বলো আমাদের কুয়োর জল কিন্তু খুবই বাক্য শেষ করতে দেয় না শৈলজা, আরে রাখো তোমার কুয়োর জল। পুকুরের জলে না নামলে চান করাই হয় না। চলো আমাদের পুকুরে চলো।

এই রকম বেকায়দায় ফেলে শৈলজা একদিন সত্যিই নজরুলকে টেনেটুনে নিয়ে আসে ম্যানেজার পুকুরের ঘাটে। শানবাঁধানো চমৎকার ঘাট। বেশ চওড়া সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে পুকুরের জলে। ডুবে থাকা সিঁড়িগুলো সবুজ শ্যাওলা দিয়ে মুড়ানো। তার উপরে পা দেওয়ার মজাই আলাদা। কিন্তু নজরুলকে সে মজা বুঝাবে কেমন করে। বন্ধুর ঠেলাঠেলিতে সে এক পা এক পা করে এগিয়ে যায়। কিন্তু কোমর জল পর্যন্ত এসে সে আর নামতে চায় না। শৈলজা পেছনে থেকে ধাক্কা দেয়,থামলে কেন, চলো।

নজরুল আর নড়ে না। শৈলজা খোঁচায়,কী হলো সামনে চলো।

সামনে তাকায় নজরুল। পুকুর ভরা অগাধ জল। দু-হাতের আজলায় সে জল তুলে গায়ে ছিটায়। কিন্তু নিচের সিঁড়িতে আর নামে না। শৈলজা এবার বন্ধুর হাত ধরে টানাটানি করে,এসো। নামো।

নজরুল কাতর কণ্ঠে অনুনয় করে, টেনো না। টেনো না শৈলজা, পা পিছলে যাবে যে।

শৈলজা হা হা করে হেসে ওঠে, কী হবে পিছলে গেলে।

ওমা, ডুবে যাব না। শৈলজা অবাক হয়,এ্যাঁ, ডুববে কেন। সাঁতার জানো না?

অকপটে স্বীকার করে নজরুল, না জানি না।

এতক্ষণে শৈলজা বুঝতে পারে কুয়োর জলে স্নান করার প্রতি তার বন্ধুর এত টান কেন, কেন সে পুকুরে নামতে ভয় পায়। বন্ধুকে দুহাতে জাপটে ধরে সে আশ্বস্ত করে, ঠিক আছে, আমিই তোমাকে সাঁতার শেখাব।

এবার ফিক করে হেসে ফেলে নজরুল,আজ নয়, অন্যদিন।

সেই অন্যদিন আর হতে চায় না সহজে। সাঁতার শেখার ফাঁদে পা বাড়াতেই যেন রাজি নয় নজরুল। শৈলজা এ কথা তুললেই সে এড়িয়ে যেতে চায়। তবু নাছোড়বান্দা হয়ে লেগে থাকে শৈলজা। নানান কথায় ভুলিয়ে ভুলিয়ে বন্ধুকে নিয়ে আসে পুকুর পাড়ে। কোমর অব্দ জলে নেমে হাত-পা ছুঁড়ে শেখাতে চেষ্টা করে কেমন করে সাঁতার কাটতে হয়। কিন্তু যে শিখবে তার মাথায় সবসময় যদি পালাই পালাই ভাবনা কাজ করে, তাকে শেখাবে কী করে। প্রথম দিন শেখাতে গিয়েও হলো তাই। চিৎ সাঁতার কাটতে কাটতে পুকুরের মাঝ বরাবর পৌঁছানোর পর শৈলজা তাকিয়ে দেখে নজরুল কেটে পড়েছে। সেও নেমেছিল জলে। হাতের আঙুল দিয়ে নাকটা চেপে ধরে টুপ করে একটা ডুব দিয়েই জল থেকে উঠে দে ছুট।

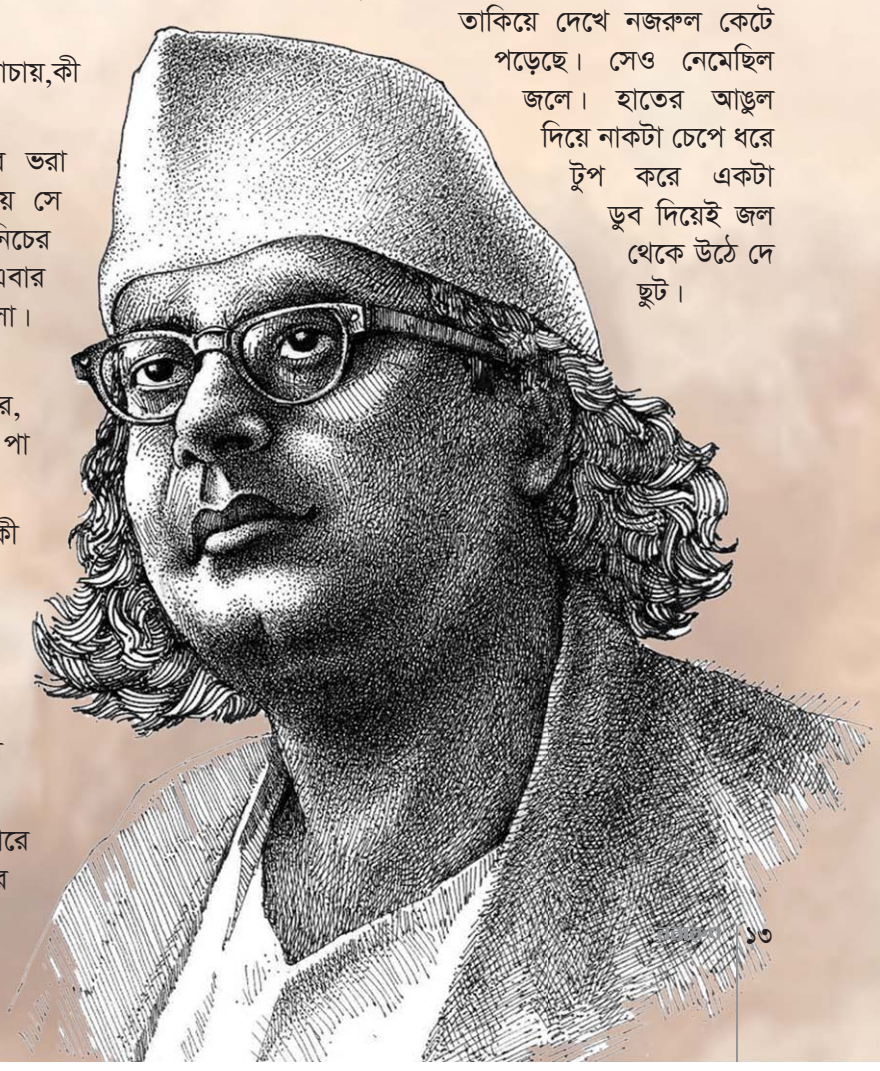

এই হলো নজরুল। সাঁতার শিখতে না চাইলে কে শেখাবে তাকে? কীভাবে শেখাবে? এদিকে শৈলজা মোটেই হতাশ হতে চায় না। অপরিসীম ধৈর্য তার। পরদিন আবার সে রাজি করায় নজরুলকে। কেমন করে রাজি করায়? নানান কথার ফাঁকে নজরুলকে সে মনে করিয়ে দেয়, তোমাদের বাড়ির পাশে বিশাল দিঘি আছে না?

হ্যাঁ আছে তো।

তারপর ওই যে উত্তর দিকের বড়ো পুকুরটা পীরের পুকুর না কী যেন নাম চটপট ধরিয়ে দেয় নজরুল,

পীর পুকুর।

তবেই বুঝে দেখো।

কী আবার বুঝে দেখব।

শৈলজা একগাল হেসে বন্ধুকে বলে,এই সব বড়ো বড়ো দিঘি পুকুরের এলাকাতেই তোমার জন্ম, বেড়ে ওঠা তাই না? কী ভেবে যেন নজরুল চুপ করে বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। শৈলজা আবারো বলে,

একটু পরেই তো অজয় নদী, কী বলিস।

নদী নয়, নজরুল শুধরে দেয় অজয় নদ। প্রবল স্রোত আছে।

হ্যাঁ, নদই বটে। শৈলজা এবার বন্ধুকে বলে, তোমার বাড়ির কাছে পুকুর-দিঘি, নদনদী, আর তুমি জানো না সাঁতার, লোকে কী বলবে তোমাকে?

এই ধাক্কাটা বেশ কাজে লেগে যায়। নজরুল মেনেই নেয় পুকুর-দিঘি এলাকার মানুষ হিসেবে তার সাঁতার শেখা উচিত। দিব্যি ঘাড় নাড়িয়ে সে ঘোষণা দিয়ে দেয়, আচ্ছা ঠিক আছে, কাল থেকে চলবে সাঁতার প্র্যাকটিস।

পরদিন দুই বন্ধু মনের আনন্দে আসছে ম্যানেজার পুকুরের ঘাটে। পুকুরের চার পাড়ে কাঁকর বিছানো পায়ে চলার পথ। সেই পথের দুধারে মৌসুমী ফুলের কেয়ারি। সেই সাথে আছে নানারকম ফল ফলারি গাছের সারি। কোন্ ফলের কী যে নাম আর কেমন যে স্বাদ দুই বন্ধু তার সব খবর রাখে না। পূর্ব দিকের পাড়ে নাম না জানা ছোটো দুটি গাছে আঙুরের মতো থোকায় থোকায় ফল ধরেছে বিস্তর। বেজায় টক, লবণ দিয়ে খেতে হয়। পথের পাশে লবণ কোথায় পাওয়া যাবে।

সব খবর জানা থাকে নজরুলের। পথের পাশে ছোট্ট এক টালির ঘরে বসে কাজ করে তিনজন মালি। সেই মালিদের ঘর থেকে লবণ সংগ্রহ করে গাছতলায় এসে তো অবাক কোথায় সেই টক স্বাদের অচেনা আঙুর। এই ফল খাওয়ার অজুহাতে সময় পার করতে চেয়েছিল নজরুল যাতে ঘাটে নামতে দেরি হয়ে যায়। আগের দিনই গাছের সব ফল পেড়ে নেওয়া হয়েছে, অসময়ে লবণ দিয়ে আর কী হবে।

চালাকি ধরা পড়ে যাবার পর নজরুল হাতের লবণ মাটিতে ঝেড়ে ফেলে বলে, আরে ধ্যাত। লবণ আবার মানুষে খায়। শৈলজা তাড়া লাগায়, খুব হয়েছে। এবার চলো, ঘাটে নামো।

ঘাটে নামা মানে তো সেই জলে নামা। ভয়ে ভয়ে একবার বন্ধুর মুখের দিকে তাকায় নজরুল। সেখানে কোনো প্রশ্রয় নেই। সাঁতার তাকে শিখতেই হবে। তবে শৈলজা তাকে আন্তরিকভাবে অভয় দেয় ভয় নেই, আমি তো আছি। নজরুলকে টানতে টানতে পুকুরের জলে নামিয়ে আনে শৈলজা। বুক সমান জলে নামা হলে শৈলজা বলে,

আমি যা বলব তোমাকে এখন তাই করতে হবে, বুঝেছ।

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে নজরুল। শৈলজা শেখায়, হ্যাঁ, এইবার পা দুটো তুলে আনো মাটি থেকে। একই সঙ্গে চেষ্টা করো জলের উপরে ভেসে থাকার। চেষ্টা করলেই হবে।

বন্ধুর মনে সাহস জোগায় শৈলজা, এই যে আমি তোমার কাছেই আছি। জলের উপরে শরীর ভাসিয়ে দাও।

আহা, হাত-পা ছুঁড়ে চেষ্টা করে দেখো না।

নজরুল কখন যে শানবাঁধানো ঘাটের শেষ ধাপ পর্যন্ত চলে এসেছে, দুজনের কেউই সেটা খেয়াল করেনি। শৈলজার পরামর্শ মতো পা উঁচু করে শরীর ভাসিয়ে তোলার চেষ্টা করে নজরুল। আর অঘটনও ঘটে ঠিক তখনই। ডুবন জলে এসে সে কী হাবুডুবু দশা নজরুলের। প্রাণের ভয়ে জাপটে ধরে শৈলজাকে।

নিজেও ডুবছে প্রিয় বন্ধুকেও উঠতে দিচ্ছে না। শৈলজা যতই চেষ্টা করে উঠে আসার নজরুল ততই জাপটাজাপটি করে জড়িয়ে ধরে। দুজনেরই সেদিন মরণদশা।

সেই সময় পুকুরে স্নান করছিল মাহবুব রায়বাহাদুরের ঘোড়ার গাড়ির কোচ ম্যান। সুঠাম শরীর, তাগড়া জোয়ান। তার নজরে পড়ে জলের ভেতরে দুই বালকের প্রাণপণ জড়াজড়ির দৃশ্য। চোখের সামনে ডুবে মরবে রায়বাহাদুরের নাতি, তা কী করে হয়? মাহবুব দুজনকেই টেনে তুলে আনে হাঁটুজলের পৈটা নাগাদ। আর একটু হলে দুজনেই যে মরতে বসেছিল, দুজনের চোখে চোখ পড়তেই সে কথা বেমালুম ভুলে যায়। কোথায় মাহবুবের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাবে সে সবের বালাই নেই। হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে দিব্যি জল ছিটাচ্ছে পরস্পরের গায়ে আবার হিহি করে হাসছে অনাবিল। এই হাসি দেখে মাহবুবের বোধ হয় একটু রাগই হয়, রাগে রাগেই বলে। কী ছেলে গো তোমরা। একটু আগে যে ডুবে মরছিলে সে হুঁশ আছে কারো?

না, সে হুঁশ মোটেই নেই। হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে তারা আবারো মেতে উঠেছে আনন্দ হল্লায়। মাহবুবের দিকে তাকাবারও যেন সময় নেই। কিন্তু মাহবুব সে কথা শুনবে কেন। সে এবার ধমকে ওঠে। ওঠো। জলদি ভাগো। নয় তো বাবুকে আমি বলে দেবো, হ্যাঁ।

তা বলতেও পারে। সে ক্ষমতা তার আছে। রায়বাহাদুরের ঘোড়ার গাড়ি চালায়, বাবুর কাছাকাছি যাবার সুযোগ পায় প্রতিদিন, তার কানে এসব কথা পৌঁছে দিতেই পারে। ভয়ে ভয়ে তারা পুকুর থেকে উঠে পড়ে। তবু শেষ রক্ষা হয় না। মাহবুব ঠিকই জানিয়ে দেয় রায়বাহাদুরকে তাঁর নাতি শৈলজা জলে ডুবে মরতে বসেছিল। রং মাখিয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বেশি করে বর্ণনা দেয়, ভয়াবহ সে বর্ণনা। এসব শোনার পর আদেশ জারি হয়ে গেল, শৈলজা আর পুকুরে নামতে পারবে না। প্রতিদিন স্নান করতে হবে বাড়ির ইন্দারার জলে। ইন্দারার পাশে জল চৌকিতে বসে থাকলেই চলবে, চাকর এসে বালতি দিয়ে জল তুলে মাথায় ঢেলে দেবে।

আদেশ শুনে তো শৈলজার মাথায় হাত, পুকুরে নামা তাহলে বন্ধ। বিকেলে শৈলজা ছুটে যায় মুসলিম বোর্ডিংয়ে, নজরুলকে খুলে বলে এই শাস্তির কথা।

পুকুরের জলে নয় ইন্দারার জলে স্নান করতে হবে শান্ত হয়ে বসে। এখন উপায়।

নজরুল মুখ খোলার আগে মুসলিম বোর্ডিংয়ের ছিনু মিঞা একগাল হাসি ছড়িয়ে বলে, ভাবনা কিসের। জল তোলা চাকরটা দু-দিনের মধ্যে পালাবার পথ পাবে না।

শৈলজা জানতে চায়, পালাবে কেন? পালাবে না? কতজল তুলবে? হাত ব্যথা করবে না? তুমি চৌকিতে বসে হুকুম চালিয়ে দেবে কত পারিস ঢাল জল। কোনো থামাথামি নেই, ঢেলে যা।

এমন ধারা সমাধানের কথায় সবাই হা হা করে হেসে ওঠে। সমাধান হয় না। শৈলজার পুকুরে স্নান বন্ধ হয়েই যায়। এদিকে শোনা যায় নজরুলের নাকি নেশা ধরে গেছে পুকুরের জলে। প্রতিদিন সে ম্যানেজার পুকুরে সাঁতার প্র্যাকটিস চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু শৈলজার কী করার আছে। ১৫/২০ দিন পরে তার হাতে এক সুযোগ এল। তার দাদামশাই রায়বাহাদুর বাড়ির বাইরে গেছে। কবে ফিরবেন ঠিক নেই। ব্যাস, স্কুল থেকে ফিরেই গায়ে তেল মেখে গামছা কাঁধে নিয়ে দে ছুট পুকুর পাড়ে। নজরুলও প্রস্তুত।

কিন্তু এ কোন নজরুল। পুকুরের জলে নামার পর তার বাহাদুরি দেখে কে। প্রাণের বন্ধু শৈলজাকে পিছনে ফেলে হাত পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে সাঁতরিয়ে সে এগিয়ে যায় সামনে আর বন্ধুর দিকে তাকিয়ে মিটমিটিয়ে হাসে। অবাক কাণ্ড হচ্ছে নজরুলের ভেতরে ভয়ডরের লেশমাত্র নেই। বেশ হাত-পা খেলিয়ে সামনে এগিয়ে চলে। শৈলজা মুগ্ধ বিস্ময়ে বলে ওঠে ভালোই তো সাঁতার শিখেছ এ কদিনে। কেমন করে শিখলে বলো তো।

নজরুল এক নিমিষেই সাঁতার শেখার রহস্য ফাঁস করে দেয়,মাহবুবের কাছে শিখেছি, হ্যাঁ।

মাহবুব! চমকে ওঠে শৈলজা। মনে মনে ভাবে মাহবুবের বিচার তো বেশ ভালো। পুকুরের জলে লাফিয়ে দাপিয়ে যার অধিক আনন্দ, দাদুর কাছে নালিশ করে তাকে পাঠিয়েছে উঠোনের কুয়ো তলায়, আর কুয়োর ব্যাঙটাকে তুলে এনে নামিয়েছে পুকুরের অগাধ জলে, শিখিয়েছে সাঁতারের নানা কৌশল। ■

নিবন্ধ

হাতের লেখা সুন্দর চাইলে

রূপন্তী রায়

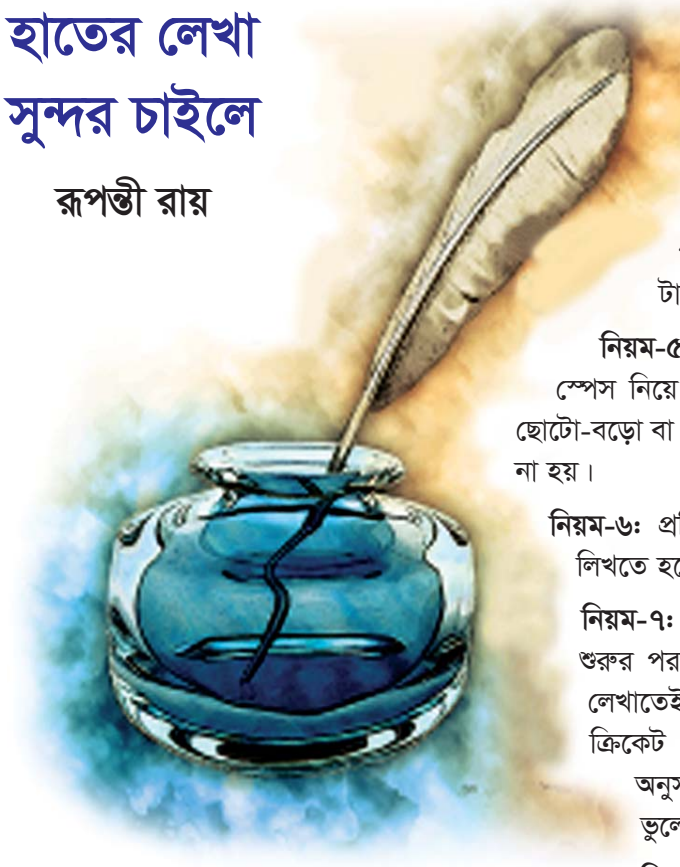

কে না চায় তার হাতের লেখা সুন্দর হোক? ছোটো-বড়ো সবাই চায়। এজন্য প্রথমেই যা করতে হবে, তা হচ্ছে চেষ্টা। আর সঠিক নিয়মে চেষ্টা করার কোনো বিকল্প নেই। হাতের লেখা অনেক ছোটো বেলা থেকেই যেমন সুন্দর করা যায়, তেমনই বুড়ো বয়সেও হাতের সুন্দর লেখার জন্য চেষ্টা করা যায়। হাতের সবচেয়ে খারাপ লেখাকে সবচেয়ে সুন্দর লেখায় পরিণত করা কেবল ধৈর্য ধরে চেষ্টাতেই সম্ভব। যদি তোমার ইচ্ছা থাকে, সময় নিয়ে সাধনা করতে পারো, তবে জেনে নাও নিয়মগুলো।

নিয়ম-১: হাতের একটি সুন্দর লেখা বাছাই করো।

নিয়ম-২: সেই লেখাটি ভালোভাবে খেয়াল করো এবং সেই অনুযায়ী হাতের লেখা লিখতে শুরু করো। প্রতিটি অক্ষরকেই সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখতে ও লিখতে হবে কিন্তু।

নিয়ম-৩: প্রথম দিকে তাড়াহুড়ো না করে আস্তে আস্তে লিখতে হবে। সময় নিয়ে অনুসরণ করা লেখাটির মতো হুবহু সুন্দর করে লেখার চেষ্টা করো।

নিয়ম-৪: লেখা বাঁকা হয়ে যেতে পারে। তাই প্রথমে দাগকাটা (দাগ টানা) খাতায় লিখতে শুরু করো।

নিয়ম-৫: প্রতিটি অক্ষর সমান উচ্চতা ও স্পেস নিয়ে লেখার চেষ্টা করো, যেন কোনোটা ছোটো-বড়ো বা কোনোটা সোজা আর কোনোটা বাঁকা না হয়।

নিয়ম-৬: প্রতিদিন কম করে হলেও পাঁচ পৃষ্ঠা লিখতে হবে, নিয়মিতভাবে।

নিয়ম-৭: হাতের লেখা সুন্দর করার চেষ্টা শুরুর পর সব ধরনের লেখাকে হাতের নতুন লেখাতেই লিখতে হবে। ক্লাসের পড়া কিংবা ক্রিকেট খেলার স্কোর হোক লিখতে হবে অনুসরণ করা লেখাটির মতো করেই। ভুলে যাও পুরানো অভ্যাস।

নিয়ম-৮: একই ধরনের কলম দিয়ে লেখার চেষ্টা করো। জেল পেন (জেল কলম) নয়, বল পয়েন্ট কলম ব্যবহার করো।

নিয়ম-৯: হাতের লেখা সুন্দর না হওয়া পর্যন্ত চেষ্টা করো বন্ধু। যতদিন হাতের লেখা হুবহু সুন্দর না হচ্ছে, ততদিন চেষ্টা চালাতে হবে। তবে দুই থেকে তিন মাস নিয়মিত লিখলে হাতের লেখা সুন্দর হবেই হবে।

নিয়ম-১০: হাতের লেখা সুন্দর হওয়ার পর লেখার গতি বাড়ানোর চেষ্টা করো। আগের চেয়ে কম সময়ে লেখাটি শেষ করার চেষ্টা করো। খেয়াল রেখো, দ্রুত লিখতে গিয়ে যেন লেখার সৌন্দর্য কমে না যায়।

এভাবে কিছুদিন চেষ্টা করলে দেখবে, তোমার হাতের লেখা সুন্দর হচ্ছে। তাড়াতাড়ি লিখলেও সুন্দর হচ্ছে। তখন তোমার হাতের লেখা দেখে সবাই বলবে, বাহ! কী সুন্দর হাতের লেখা! ■

নিবন্ধ

‘অ্যামবিগ্রাম’ এক দলছুট শিল্প!

মোঃ মোরসালিন বিন কাশেম

‘অ্যামবিগ্রাম’ শিল্পের মূলধারার উজানে চলা এক শিল্প। বলা যায় শিল্প ও বিজ্ঞানের একটি অদ্ভুত রেসিপি এই শিল্পধারাটি। অনেকে একে ক্যালিওগ্রাফি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত করলেও আসলে তা স্কুল পালানো দলছুট এক শিল্প এই অ্যামবিগ্রাম। অ্যামবিগ্রাম শব্দটিকে দুটি ল্যাটিন শব্দে ভাগ করা যায়। অ্যামবি = উভয়। গ্রাম = শব্দ। অ্যামবিগ্রাম শব্দের ভাবার্থ দাঁড়ায় উভয় দিক থেকে পড়া যায় এমন শব্দ। মানে হচ্ছে অ্যামবিগ্রাম কোনো শব্দের এমন একটি শিল্পরূপ যে শব্দকে দুই ভাবেই পাঠক পাঠ করতে পারে। সোজা ভাবে এবং একদম ১৮০ ডিগ্রি ঘুরিয়ে মানে উলটো করে। নিচের একটি সহজ শব্দ দিয়ে এর উদাহারণ দিলে বিষয়টা পরিষ্কার করা যায়।

অ্যামবিগ্রামের উৎপত্তি নিয়ে মজার একটি মিথ বা উপকথা চালু আছে। বলা হয়ে থাকে, প্রায় চারশ বছর আগে বিজ্ঞানী গ্যালিলিও-এর আদেশে প্রথম এই শিল্পের পদচারণা শুরু করেন শিল্পী বানিনি। তবে আধুনিক ইতিহাস বলে শিশুসাহিত্যিক পিঠার নিউত্তয়েলের হাত ধরেই ১৯৩০ সালে এই শিল্পের যাত্রা। ক্যালিওগ্রাফি বা টাইপোগ্রাফি শিল্পের সাথে এই শিল্পের মূল পার্থক্য হচ্ছে- এই দুটি শিল্পে যেমন শব্দের নান্দনিকতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। তেমনি অ্যামবিগ্রাম শব্দে নান্দনিকতার বাইরেও আরেকটি গুণাগুণকে প্রাধান্য দিতে হয় শিল্পীকে। তা হচ্ছে বোধগম্যতা। অর্থাৎ শব্দকে এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে উভয় পাশ থেকেই শব্দটিকে পাঠক সহজেই পড়তে পারে। এখানেই অ্যামবিগ্রাম অন্য সব শিল্পকে অতিক্রম করে যায়। এটি যতটা না শিল্প তারচেয়ে বেশি যেন একটি গণিত। একটি ধাঁধা, একটি কবিতা যা সমাধান করতে একজন শিল্পীর কেটে যায় রাতের পর রাত। অপ্রচলিত হলেও এই শিল্প ধারাটি আজ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হচ্ছে। বিস্তৃত হচ্ছে। ■

শ্রদ্ধাঞ্জলি

বিখ্যাত গীতিকার জেব-উন-নেসা জামাল (২৭শে ডিসেম্বর, ১৯২৬ - ১লা এপ্রিল ১৯৯৫) ছিলেন ঢাকা বেতারের কণ্ঠশিল্পী, কথিকা পাঠক ও অনুষ্ঠান পরিচালক। দেশাত্মবোধক ও মরমি গান রচনায় তাঁর তুলনা নেই। ছোটোদের জন্য লিখেছেন দুই হাতে। তাঁর খুব জনপ্রিয় একটি গান আজ দিচ্ছি, শিখে নিয়ে গাও গলা ছেড়ে।

জাদুর পেন্সিল, আহা জাদুর পেন্সিল

জেব-উন-নেসা জামাল

জাদুর পেন্সিল, আহা জাদুর পেন্সিল
আমার থাকত যদি এমন একটি জাদুর পেন্সিল
তাতে যা আঁকা যা আঁকা যায় সত্যি হতো-
হাতের মুঠোয় পেতামরে ভাই বিশ্ব নিখিল।
খিদে পেলে সে পেন্সিলে
মিঠাই মণ্ডা আঁকতাম
তারপরে ভাই পেটটি পুরে
খেতাম এবং চাখতাম
রসে ভরা রসগোল্লা
খাজা গজা কালো জাম
তোমাদেরও খানিক দিতাম হয়ে দরাজদিল।
আরো শোনো রকেট এঁকে
সে রকেটে চড়তাম
গ্রহে গ্রহে উপগ্রহে
চাঁদের দেশে ঘুরতাম
যখন খুশি যেথায় খুশি
মনের সুখে উড়তাম
পাখির মতো ছুঁয়ে ছুঁয়ে আকাশের ওই নীল।

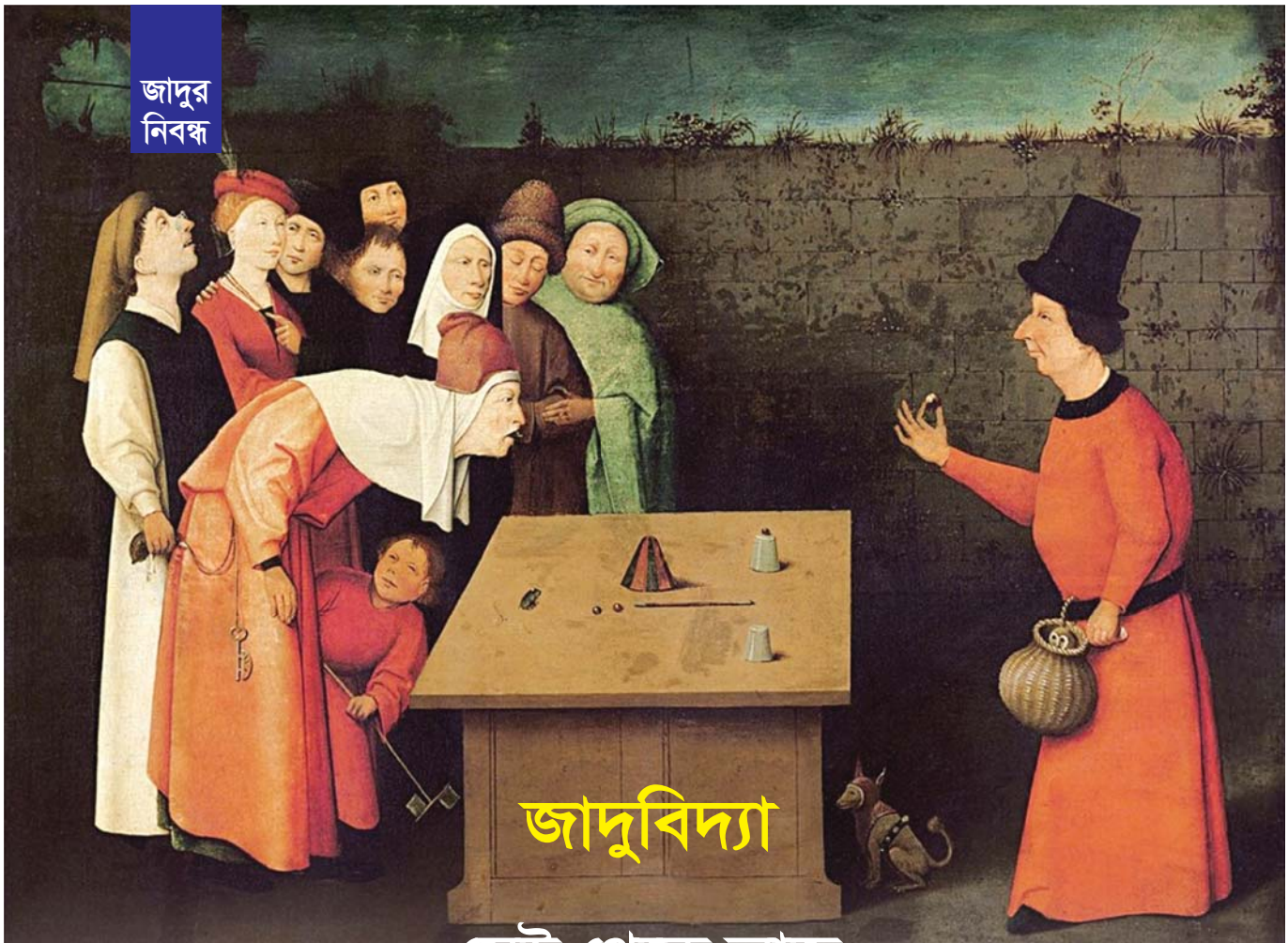

জাদুবিদ্যা

সেই থেকে আজ

রাজীব বসাক

এই সময়ের দর্শক, একই সাথে পাঠকদের মধ্যেও জাদু নিয়ে কৌতূহলের অন্ত নেই। যদিও এক সময় পরম্পরার হাত ধরে মন্ত্রগুপ্তিতে নিঃশেষ হতে বসেছিল যে জাদুচর্চা, সময়ের আবর্তে মার্জিত রুচির কিছু জাদুশিল্পীর কল্যাণে এটিই আজ বৃহৎ জনগোষ্ঠীর গন্ডির মধ্যে এসে ধরা দিয়েছে সহজেই। যে জাদুকে লোকে তন্ত্র-মন্ত্র-তুক্ তাক্-ঝাড়ফুঁক মনে করে ভয়ে এবং অনাদরে দূরে সরিয়ে রেখেছিল, প্রযুক্তির এই স্বর্ণ সময়ে এসে তারাই আজ এটিকে আপন করে নিয়েছেন যন্ত্রকৌশল, হাত সাফাই আর উপস্থাপনার নৈপুণ্য গুণে। এজন্যে বড়ো কৃতিত্বটা বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাভাবনার উৎকর্ষতারও।

জাদুর জন্মকথা

জাদুর ইতিহাস নিয়ে প্রকাশিত 'ওয়েস্টকার পেপিরাস' নামীয় একটি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করা গেছে, যেটি লেখা হয়েছিল যীশুখ্রিষ্টের জন্মেরও সতের'শ বছর আগে। খ্রিষ্টপূর্ব চার হাজার বছর আগে মিশরের রাজা খুফুর সময়কার বেশ কিছু জাদু প্রদর্শনের বর্ণনা রয়েছে তাতে। রাজা খুফু বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন পিরামিডের নির্মাতা হিসেবে।

তারও অনেক অনেক পরে ১৫৮৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত ভৌতিক জাদুর উপর লেখা 'ডিসকভারি অব উইচক্রাস্ট' বইটি জাদুকে নিয়ে আসে পাদপ্রদীপের আলোয়।

নতুন করে শুরু

তখনো পর্যন্ত জাদুর শুরুটা ধরা হতো ভয় থেকে। সাধারণ মানুষদের কল্পনাশক্তির কোনো প্রভাব দিয়ে যেটির বিশ্লেষণ সম্ভব ছিল না।

মূলত উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে এসে জাদুচর্চা সম্পূর্ণভাবে বিনোদনের নতুন একটা মাধ্যম হিসেবে গ্রিক প্রকৌশলী গণিতজ্ঞ হেরন-এর হাত ধরে পরিপূর্ণতা লাভ করে। ফলস্বরূপ উত্তরণ ঘটে বড়ো মাপের কিছু জাদুকরদের, যাদের দেখানো পথ ধরেই পরবর্তী দশকগুলোর জাদুচর্চা গুটি গুটি পায়ে এগুতে থাকে। যাদের মধ্যে শিভালিয়ার পিন্নোটি, ক্যাগলি অস্টো, ফিডারেক মেসমার, সেন্ট কার্মেইন, প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। আর এর সূত্র ধরেই ক্রমে ক্রমে দানা বাঁধতে শুরু করে জাদুকরদের মধ্যে পেশাদারি মনোভাবের।

আধুনিক জাদুবিদ্যার জনক

মূলত উপস্থাপন কৌশলের নতুন সব পদ্ধতি সংযোজনের মধ্য দিয়েই নিজেকে যিনি প্রমাণ করেন

আধুনিক জাদুবিদ্যার জনক হিসেবে, তিনি হলেন রবার্ট হুডিন (১৮০৫-১৮৭১)। জন্মসূত্রে ফরাসি। পাশাপাশি বিজ্ঞানেও যার দখল ছিল অসামান্য। বিদ্যুতের কার্যকরী প্রয়োগ সম্পর্কে তার কিছু মৌলিক আবিষ্কার একজন কৃতি বিজ্ঞানী হিসেবে তাকে স্বর্ণপদক এনে দিয়েছিল।

এতদঞ্চলের জাদুচর্চা

পরিব্রাজক ইবনে বতুতা ১৩৫৫ সালে ভারতবর্ষে ভ্রমণ করতে এসে মাদ্রাজে এক বৃদ্ধকে খোলা মাঠে খাড়া একটি রডের উপর কনুই ছুঁয়ে একটি মেয়েকে শূন্যে ভাসিয়ে রাখতে দেখেন। যেটি পরবর্তীতে তিনি তাঁর ভ্রমণ বিষয়ক লেখাতে উল্লেখও করেছেন। ইতিহাসের প্রাপ্ত সাক্ষ্য মতে এ অঞ্চলের জাদুচর্চার শুরুটা তাই এখান থেকেই ধরা হয়।

প্রথম বাঙালি পেশাদার জাদুকর

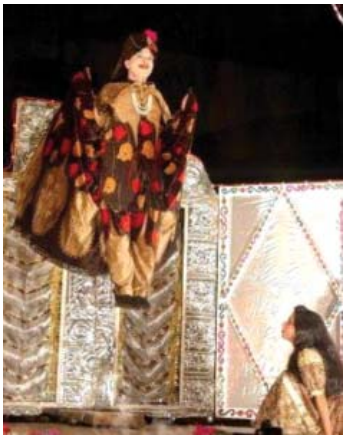

সালটা ১৯২৬। ঢাকার রেলওয়ে ইনস্টিটিউটে দর্শনীর বিনিময়ে এককভাবে জাদু প্রদর্শন করেন যতীন্দ্রনাথ রায়, পোশাকি নাম জাদুকর রয় দ্যা মিস্টিক। জন্ম- ১৪ই জুন, ১৮৯১। আর মৃত্যু- ২৩শে জানুয়ারি, ১৯৭৭।

কোনো ধরনের অবলম্বন ছাড়াই একটি মেয়েকে (মেয়ের পোশাকে একজন নেপালি যুবক) শূন্যে ভাসিয়ে রাখার জাদুটি রীতিমতো হইচই ফেলে দিয়েছিল সেই সময়।

তাছাড়া ১৯৪৭-এর পরে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম যে জাদুকরের নাম শোনা যায়, তিনি হলেন জাদুরাজ আব্বাস উদ্দিন। চট্টগ্রামে বাড়ি তার। কিন্তু জাদুবিদ্যা শেখেন কলকাতাতে, পিসি সরকারের সান্নিধ্যে। তার জাদুর তালিকায় ছিল ইল্যুশান ট্রি, ইল্যুশান বক্স, কামানের জাদু সহ আরো কত কি।

ঢাকায় ভিনদেশি জাদুকর

১৯০৮ সালের ১৯শে আগস্ট। ঢাকার কোনো এক মঞ্চে জাদু প্রদর্শন করতে আসেন সেই সময়কার বিখ্যাত জাদুকর এমিন সোহরাবর্দি। শূন্যে ভাসমান তরুণী, তালাবদ্ধ বাক্স থেকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি সব জাদু প্রদর্শন করে ঢাকাবাসীদের তিনি মন্ত্রমুগ্ধ করে গিয়েছিলেন।

এরও অনেক পরে আমেরিকার বিখ্যাত জাদুকর ভার্জিল এবং তার স্ত্রী জুলি সদলবলে ১৯৫৭ সালে জাদু দেখাতে আসেন ঢাকায়। প্রদর্শনীটি হয়েছিল

গুলিস্থান প্রেক্ষাগৃহে। ভার্জিল তার স্ত্রী জুলিকে বিরাট একটি কামানের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে নিজেই তাতে আগুনের সল্‌তে ধরিয়ে দিলেন। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে প্রকম্পিত হলো চারদিক। কিন্তু এর-ই মধ্যে জুলি উধাও!

শেষতক জুলিকে বের করে আনা হলো প্রেক্ষাগৃহের ছাদের কোনায় আগে থেকে ঝোলানো তালাবন্দি একটি বাক্স থেকে। অসাধারণ এই জাদুটি সেই সময়কার ঢাকার দর্শকদের বিমোহিত করে দিয়েছিল।

লৌদি ব্রাদার্স, ফজল করিম- এই জাদুকররাও তার কিছু সময় পরে সুদূর করাচি থেকে ঢাকায় আসেন জাদু দেখাতে। ফজল করিম পাখির খেলা এবং পুতুল নাচের জাদুতে পারদর্শী ছিলেন। আর লৌদি ব্রাদার্স জাদু দেখাতেন ইউরোপীয় পোশাকে।

অলিয়ঁস ফ্রঁসেস-এ আমন্ত্রণে সাতাশি সালের শেষের দিকে ফরাসি জাদুকর জ্যাঁ কুঁয়ে ডিলর্ড যে মনোরম জাদু সন্ধ্যাটি ঢাকাবাসীকে উপহার দেন, তা অনেক অনেকদিন ধরেই উদাহরণ হয়ে থাকবে তাদের কাছে।

বাংলায় জাদু শিক্ষার প্রথম বই

ঊনিশ শতকের গোড়ার দিকে জাদুর উপর ছোটো একটা বই প্রকাশিত হয়েছিল 'গণপতি'র জাদুবিদ্যা' নামে। বইটির লেখক ছিলেন জাদুকর গণপতি চক্রবর্তী (১৮৫৮-১৯৩৯)। তবে তারও আগে বিখ্যাত বটতলা অঞ্চল থেকে 'ভেলকি ও ভোজবাজি' নামে আরো একটি জাদুবিদ্যার বই প্রকাশিত হয়েছিল, যেটির লেখক ছিলেন জাদুরসিক ভুন্তনাথ মান্না। বইটির প্রকাশকাল জানা না গেলেও এর মূল্য ছিল সেই সময়কার এক টাকা।

থেমে থাকেনি জাদুচর্চা

যুদ্ধবিধ্বস্ত সামাজিক অস্থির পরিস্থিতির মধ্যে ঝিমিয়ে পড়া জাদুর এই পরিবেশে ৫০ ও ৬০ দশকের কিছু জাদুকর ছোটো ছোটো সব জাদু প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে জাদুর প্রায় নিভে যাওয়া আগুনকে ধিকি ধিকি করে জ্বালিয়ে রাখেন এবং ৭০-এর শেষ ভাগে গিয়ে তারা জ্বলে ওঠেন আপন শক্তিতে। এদের মধ্যে জুয়েল আইচ, এম.আর. হারুন, উলফাৎ কবির, শাহ্‌মনি, জর্জ ডি ক্রুজ, জাহিদ খান পাঠান সহ আরো অনেক অগ্রগণ্য।

একজন পিসি সরকার

পিসি সরকার (১৯১৩-১৯৭১) পুরো নাম প্রতুল চন্দ্র সরকার। ১৯১৩ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইল জেলার আশেকপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। ১৯৩৩ সালে গণিত শাস্ত্রে অনার্স সহ বি.এ. পাস করে জাদুকে তিনি পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। উপমহাদেশে ইউরোপীয় জাদুকরদের পোশাকের বিপরীতে তিনিই প্রথম প্রচলন করেন মাথায় শেরওয়ানি এবং পায়ে নাগরা জুতো। পৃথিবীর ৭০টিরও বেশি দেশে তিনি জাদু প্রদর্শন করেন।

১৯৪৭-এ দেশবিভাগের আগেই তিনি কলকাতা চলেন যান। জাদুতে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৬৪ সালে ভারত সরকার কর্তৃক সর্বোচ্চ সম্মান হিসেবে পদ্মশ্রী উপাধি লাভ করেন। ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ সালে

জাপানের জিগ্যেৎসু শহরে জাদু প্রদর্শন চলাকালীন তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

বর্তমানে তাঁর মধ্যম পুত্র প্রদীপ চন্দ্র সরকার 'পিসি সরকার জুনিয়র' নামে জাদুর পারিবারিক উত্তরাধিকার ধরে রেখেছেন।

অতঃপর জুয়েল আইচ

জাদুকে বাংলাদেশে সত্যিকার অর্থে শিল্পীত একটি জায়গায় নিয়ে যেতে যার একক ভূমিকা প্রশ্নাতীত, তিনি আর কেউ নন– আমাদেরই জুয়েল আইচ। বরিশালের পিরোজপুর জেলার সমদেকাঠি গ্রামে ১৯৫২ সালে ১০ই এপ্রিল জন্ম নেওয়া পর্বতসম আত্মবিশ্বাসী এই মানুষটি একাধারে চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, বংশীবাদক, মুক্তিযোদ্ধাও। ৭৭-এর অগ্নিকাণ্ডে সবকিছু হারিয়েও যিনি ঘুরে দাঁড়িয়েছেন নিজে পাশাপাশি শিল্প হিসেবে জাদুকেও দাঁড় করিয়েছেন অনন্য এক উচ্চতায়।

প্রদর্শন করেছেন বিশ্বের অনেকগুলো দেশে। বিপরীতে জয় করে নিয়েছেন বিশ্বব্যাপী লাখো মানুষের ভালোবাসা, স্বীকৃতি, সম্মান আর প্রশংসাপত্র। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক দেশের সবচেয়ে সম্মানজনক একুশে পদকও লাভ করেছেন তিনি। শিশুদের জন্য জনমত ও সচেতনতা গঠনে জাদুশিল্পের আকাশ ছোঁয়া সাফল্যের এই কিংবদন্তী মানুষটি বর্তমানে ইউনিসেফের দূত হিসেবে কাজ করছেন।

দেশের প্রথম জাদুকর দম্পতি

স্বাধীন বাংলাদেশে জাদুকর দম্পতি হিসেবে শুরু থেকেই যাদের নাম শুনে এসেছি, তারা হলেন জাদুকর উলফাৎ কবীর এবং তার পত্নী রোকসানা কবীর। চট্টগ্রামের বেড়ে উঠা এই জাদুকর দম্পতি পরবর্তীতে ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

ছোটোদের কাছে ম্যাজিক আঙ্কেল নামে পরিচিত এই জাদুকর জাদুর সাথে জড়িয়ে আছেন জীবনের প্রায় পুরোটা সময়, দীর্ঘ পাঁচ যুগেরও বেশি। নির্দ্বিধায় তার প্রদর্শনী দর্শক সমাজে বেশ উচ্চ প্রশংসিত।

একজন রাজীব বসাক

বাংলাদেশে পেশাদার জাদুকরদের মধ্যে তিনিই একমাত্র জাদুকর, যিনি ঢাকার বাইরে থেকে জাদুচর্চা করে চলেছেন। কথার জাদুকর হিসেবেও যার সুখ্যাতি দেশজোড়া। জাদু নিয়ে প্রচুর লেখালেখিও করেন তিনি।

জাদুকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে যিনি পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে আসছেন, তিনিই জাদুকর রাজীব বসাক। বিশ্বাস করেন– জাদুর পরশেও জেগে উঠতে পারে বাংলাদেশ। দুরন্ত টেলিভিশনে প্রচারিত 'সোনার কাঠি, রূপার কাঠি' অনুষ্ঠানটি এখনো শিশু-কিশোরদের

মুখে মুখে ফিরে শুধুমাত্র জাদুকর রাজীব বসাকের অনবদ্য নৈপুণ্য সমৃদ্ধ উপস্থাপনার গুণে। সবার কাছে তিনি জাদুকর নামে পরিচিত।

ভালো জাদুশিল্পী হতে হলে

মনে রাখবে– এজন্যে প্রথমেই তোমার দরকার হবে অভিনয় জ্ঞান। পাশাপাশি দর্শক চাহিদাকেও প্রাধান্য দিতে হবে। বিজ্ঞানমনস্ক হতে হবে। সবচেয়ে জরুরি তোমার জাদুকর চরিত্রটিকে বিশ্বাসযোগ্য করতে প্রদর্শনের মুহূর্তগুলো তোমার তৈরি করা জানতে হবে। সাংগঠনিক ক্ষমতা, সুন্দরভাবে কথা বলার দক্ষতা, ব্যক্তিজীবনে সংযমী এবং দৈহিকভাবে সুস্থ হওয়াটা চাই চাই।

পেশা হিসেবে জাদুশিল্প

জাদু শিল্পকে মানুষ অংঙ্ক কষে হিসাব করে পেশা হিসেবে নির্বাচন করে না তবুও অমিত সম্ভাবনা রয়েছে এই পেশায়। সেক্ষেত্রে জাদুকে গ্রহণ করতে হবে অন্তর্গত প্রণোদনায়।

তবুও কথা থেকে যায়

এমন কিছু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-তথ্য ও ঘটনা আছে, যা মূল সত্যের হিসেবে একদম খাঁটি বিজ্ঞানের কট্টর বাস্তব ব্যাপার। কিন্তু আমাদের চিন্তা-বুদ্ধি আর জ্ঞানের পরিধির বাইরে থাকায় এর অনেক কিছুই অলৌকিক একটা চেহারা নিয়ে নিয়েছে। ফলে অলৌকিক হিসেবে এর কিছু কিছু আমরা কখনো-সখনো অনুভব করি সত্যি, কিন্তু কারণটা বুঝে উঠার চেষ্টা করি না। কখনো কখনো আজগুবির আওতায় ফেলে দেই এইসব, কোনোরকম প্রমাণের চেষ্টা না করেই। এভাবে কত সত্য, কত বিজ্ঞান আমাদের কাছে মিথ্যে হয়ে আছে কিংবা থাকবে, জাদু হিসেবে যেসব শুধু আমাদের বিনোদনই দিয়ে যাবে আর কল্পলোকের সামগ্রী হয়ে থাকবে। আমরা হয়ত অবাক হয়ে সেগুলোকে শুধু ঘটতেই দেখব। কিন্তু কারণটা আর কোনোদিনই বোঝা হয়ে উঠবে না আমাদের।

এক হালি ম্যাজিক

কেমন করে শূন্যে ভাসে

চোখের সামনেই কিছু একটাকে শূন্যে ভেসে থাকতে দেখলেই তোমরা সেটাকে জাদু বলে ধরে নেবে – তাই না! সত্যিটা তোমাদের বলেই দেই। জাদু বলে পৃথিবীতে সত্যিই কিছু নেই। এটা কেবল বিশেষণ। দেখ না, আব্বু-আম্মুরা তোমাদের কেমন আদর করে জাদু সোনা বলে ডাকে।

সামনের জাদু

জাদুকরের হাতে বেশ কয়েকটা কাগজের তৈরি গ্লাস। সেগুলোর প্রত্যেকটাকেই তিনি তার দর্শকদের দিয়ে খুব ভালোভাবে পরীক্ষা করিয়ে নিলেন। এবার দর্শকদের বললেন গ্লাসগুলো থেকে যে-কোনো একটা গ্লাস তাদের পছন্দনুযায়ী জাদুকরের হাতে দেওয়ার জন্যে।

দর্শকদের পছন্দ করা গ্লাসটি জাদুকর তার দুহাত দিয়ে নাড়াচাড়া করে দেখছেন। এবারে জাদুকর গ্লাসটিকে তার বাম হাতের তালুর উপর রেখে ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে গ্লাসটিকে ছুঁতেই সেটি কেমন অবলীলায় শূন্যে ভাসতে লাগল।

জাদুকরও নানান ভঙিমায় গ্লাসটিকে শূন্যে ভাসিয়ে দেখালেন এবং প্রমাণের চেষ্টা করলেন যে গ্লাসটিতে কিংবা তার হাতে আপাত কোনো কৌশল করা নেই।

তবুও তো কৌশল

আগেই বলেছিলাম যে কৌশলের অন্য নামই জাদু। এখানেও জাদুকর কিন্তু ছোট্ট একটা কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন। চল তবে, সেটাই আগে জেনে নেওয়া যাক্।

ব্যবহৃত কাগজের গ্লাসগুলোর প্রত্যেকটাই সাধারণ – এতে কোনো সন্দেহ নেই। জাদুকর তার সুবিধামতো আশপাশে কোথাও স্কচ টেপ দিয়ে তৈরি গোলাকৃতি গিমিকটাকে (জাদুর ভাষায় কৌশল করা জিনিসটাকে

গিমিক বলা হয়) লুকিয়ে রেখেছিলেন। দর্শকদের দিয়ে গ্লাসগুলো তো তিনি পরীক্ষা করিয়ে নিলেন, নিজের হাত দুটোকেও খালি দেখালেন সত্যি – কিন্তু কৌশলে কোনো এক ফাঁকে তিনি নিজের ডান হাতের বুড়ো আঙুলে লাগিয়ে নিলেন স্কচটেপের টুকরোটি।

বাকিটা জীবন সহজ। টেপটা তো জাদুকরের বুড়ো আঙুলেই লেগে আছে। স্বচ্ছ হওয়ায় সেটা ঠিক নজরেও আসবে না দর্শকদের। ধীরে ধীরে উপস্থাপনের অভিনয়জ্ঞানটা জাদুকর এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকলেন, আর দর্শকরা গ্লাসটি শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে ভেবে অভিভূতই হবেন নিশ্চিত।

পাদটীকা : চাইলে স্কচটেপের স্থলে উভয়মুখী টেপ (Both Side Tape) ব্যবহার করতে পার। এতে সুবিধা বেশি, ঝুঁকিও কম।

টাকা কেমন করে ভাসে...

শুনেছি আজকে যেটা জাদু, কাল সেটাই নাকি বিজ্ঞান। ভাবছ–এমন কথা কেন বললাম? শোনো, তোমরা নিশ্চয় জানো যে উনিশ শতকের গোড়ার দিকেই উইলবার রাইট এবং অরভিল রাইট নামীয় দুই ভাই মিলেই আবিষ্কার করেছিলেন উড়োজাহাজ। যার সাহায্যেই মানুষ প্রথম শূন্যে ভাসতে শেখে। কিন্তু তারও আগে আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে ফরাসি জাদুকর র‍্যাবেয়ার উদ্যা একজন মেয়েকে কোনোরকম অবলম্বন ছাড়াই শূন্যে ভাসিয়ে বিশ্ববাসীর নজরে এসেছিলেন।

এসব কথার অবতারণা এজন্যেই যে আজ তোমাদের শেখাতো অন্যেরা যেটা পারবে না, সেটাতেই তুমি কেমন করে শূন্যে ভাসাবে!

জাদুকরের জাদু : রহস্যময় একটা হাসি ঝুলে আছে জাদুকরের মুখে। সাধারণ দুইটি কাচের গ্লাসকে উপস্থিত দর্শকদের দিয়ে ভালোভাবেই পরীক্ষা করিয়ে নিলেন জাদুকর। এরপর গ্লাস দুইটিকে পাশাপাশি টেবিলের উপর উপুড় করেই রাখলেন। এইসাথে দর্শকদের কারো কাছ থেকে চেয়ে নিলেন একটি একশ কিংবা যে-কোনো মূল্যমানের কাগজের একটি নোট। টাকাটিকে দুই হাতে ধরে নিয়ে সমান্তরালভাবে ভাঁজ করলেন টাকার ঠিক মাঝখানটায় এবং সে অবস্থায় সেটিকে গ্লাস দুইটির উপর চিত্র-১ এর মতো করেই বসিয়ে দিলেন। এবারে দর্শকদের উদ্দেশ্য করে 'এর যে-কোনো একটি গ্লাসকে সরিয়ে নিলেও টাকাটি সেই একইভাবে শূন্যে ভেসে থাকতে পারবে' বলতে বলতেই এর যে-কোনো একটি গ্লাস তিনি নিজ হাতেই সরিয়ে নিলেন, অনেকটা চিত্র-২ এর মতো। সত্যিই তো টাকাটি কেমন অবলীলায় শূন্যেই ভেসে রইল। চোখের সামনেই এমন ভূতুড়ে কাণ্ড ঘটতে দেখে উপস্থিত দর্শকরা সত্যিই কেমন 'থ' বনে গেলেন।

পেছনের জাদু : কিছুই না, একটি কয়েন অর্থাৎ পয়সাকে তোমার হাতের ভেতর লুকিয়ে রাখতে হবে।

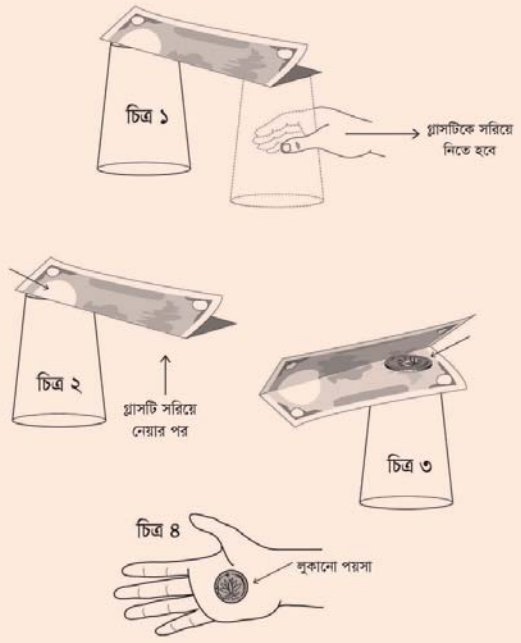

বোঝার সুবিধার্থে চিত্র-৪ দেখো। হাতের তালুতে খুব কৌশলে একটি পয়সাকে লুকিয়ে রাখার কৌশল রপ্ত করতে পারলেই খুব সহজে এ জাদুটি তুমি তোমার দর্শক বন্ধুদের দেখিয়ে অবাক করে দিতে পারবে।

প্রদর্শন পদ্ধতি : দর্শকদের কাছ থেকে সাধারণ একটি কাগজের নোট/টাকা চেয়ে নাও। এমনটি করার কারণ, দর্শকদের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করা। এবার কাগজের নোটটিকে সমান্তরালভাবে মাঝখানে ভাঁজ কর। অনেকটা চিত্র-১ এর মতো করে ভাঁজ করা টাকাটিকে উপুড় করে রাখা গ্লাস দুইটির উপর এমনভাবে বসাও,

যাতে যেন দুইটি গ্লাসের মাঝখানে খানিকটা ফাঁক থাকে এবং টাকার দুই দিকের প্রান্ত দুইটি গ্লাস দুইটির ঠিক মধ্যিখানে থাকে। এবারে তোমার দর্শকদের বলো যে এর মধ্যে যদি যে-কোনো একটি গ্লাস সরিয়ে নেওয়া হয়, তবে? কিছুটা সময় দিয়ে সত্যি সত্যিই একটি গ্লাসকে তুমি সরিয়ে নাও। তাতে করে টাকাটা ভারসাম্য বজায় রাখতে না পেরে নিশ্চিত নীচে পড়ে যাবে এবং দর্শকরাও সেটি দেখবেন।

এবারে তুমি তোমার ডান হাতের সাহায্যে টাকাটিকে তুলে নাও এবং তোমার বাম হাতে আগে থেকেই লুকিয়ে রাখা পয়সাটিকে চিত্র-৩ এর মতো করে কাগজের নোটটির সমান্তরাল ভাঁজের ভেতর যে-কোনো একটি কোণে ঢুকিয়ে দাও। যেন প্রথমত কোনোভাবেই তোমার দর্শকরা ব্যাপারটি টের না পান এবং দ্বিতীয়ত পয়সা সমেত কাগজের নোটের প্রান্তটিকে উপুড় করা যে-কোনো একটি গ্লাসের ঠিক মাঝখানে বসিয়ে দাও।

বাকিটা জাদু! নিজেই চেষ্টা করে দেখ আর কয়েকবার করে চর্চা করে খুব ভালোভাবে বিষয়গুলো রপ্ত করে নিয়ে তবেই দেখাও তোমার বন্ধু কিংবা অন্যদের।

পাদটীকা ঃ কেন এমনটি হচ্ছে বলতে পার? ঠিকই ধরেছ। পয়সাটি কাগজের নোটের এক কোণে ভরের কাজ করেছে বিধায় আপাতদৃষ্টিতে টাকাটি নিজের ভারসাম্য বজায় রাখতে পেরেছে বলে মনে হচ্ছিল। আর অন্যদিকে দর্শকরাও এটিকে জাদু বলে ভেবে নিয়েছেন।

কেমন করে পারি দেখ...

কৌশলের কিস্তিমাতেই দর্শকদের মন জয়ের চেষ্টা করেন জাদুকর। সাথে নিপুণ অভিনয় তো আছেই। এ কাজে যে যত বেশি সফল, সে ঠিক তত বড়ো জাদুকর।

আজ তোমাদের এমনই একটা জাদু ও তার পেছনের কৌশল নিয়ে কথা বলব, খুব ভালোভাবে চর্চা করে যদি এটাকে দেখাতে পার, নিশ্চিত জেনো জাদুকরদের ক্লাবে তোমার অন্তর্ভুক্তিও আজ থেকে নিশ্চিত। দেখে নেওয়া যাক ---

জাদুকরের জাদু ঃ নিজের পকেট থেকে জাদুকর তার ডান হাতের সাহায্যে সুদৃশ্য একটা চামচ বের করে আনলেন। নিজের হাতে ধরে রেখেই তার চারপাশে ঘিরে থাকা দর্শকদের চামচটি এদিক-ওদিক করে খুব ভালোভাবেই দেখিয়ে নিলেন এবং প্রকারন্তরে বোঝানোর চেষ্টা করলেন চামচটি নেহাতই সাধারণ।

এবারে চামচটিকে ঠিক মাঝ বরাবর নিজের ডান হাতেরই তিনটি আঙুল দিয়ে অনেকটা আল্‌তো ভাবেই নিলেন জাদুকর। চোখের দৃষ্টিও কেমন স্থির হয়ে আছে তার। বিড়বিড় করে মুখের মধ্যেই কি যেন সব আওড়ে যাচ্ছেন তিনি। হঠাৎ করেই জাদুকরের চারপাশে জাদু দেখতে থাকা দর্শকরা দেখলেন ধীরে ধীরে জাদুকরের হাতে থাকা চামচটি কোনো অদৃশ্য জাদুবলে যেন বেঁকে যেতে শুরু করেছে (চিত্র-৩)। হ্যাঁ, সত্যি। আবারো একই কায়দায় ধীরে ধীরে চামচটিকে ঠিক আগের মতোই সোজা করে নিলেন জাদুকর।

পেছনের জাদু : শুরুতেই তোমাকে এজন্যে জোগাড় করে নিতে হবে সাধারণ মানের দুই থেকে তিনটে চামুচ। বড়োদের কারো সাহায্য নিয়ে এর মধ্যে যে-কোনো একটা চামচকে মাঝ বরাবর কেটে নিয়ে দু'টুকরো করে নাও (চিত্র-১)। এবারে কাটা চামচটির কাটা অংশে খানিকটা ফাঁক রেখে কালো এক টুকরো ইলেকট্রিক টেপ দিয়ে কাটা অংশটিকে ভালো করে মুড়িয়ে নাও (চিত্র-২)। টেপ দিয়ে মোড়ানোর পর নিজে একটু ভালো করে দেখে নাও কাটা অংশ বরাবর চামচটিকে ভাঁজ করা যাচ্ছে কিনা (চিত্র-৩) !

চিত্র ১

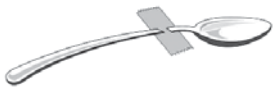

চিত্র ২

চিত্র ৩

এ কাজের পর বলা যেতে পারে এই জাদুটি দেখানোর জন্যে তুমি এখন পুরোপুরি তৈরি।

প্রদর্শন পদ্ধতি : যেহেতু চামচটি কৌশল করা, সেহেতু সেটাকে একটু আড়ালে রাখতেই হবে। মঞ্চে যদি জাদু দেখাও, তবে অন্য কোনো জাদুর সরঞ্জামের পেছনে এটিকে রাখতে পার। আর যদি ঘরোয়া পরিবেশে কাউকে দেখাতে চাও, সেক্ষেত্রে কৌশল করা চামচটিকে নিজের পরিধেয় প্যান্টের ডান পকেটে রেখে দিতে পার।

জাদুটি দেখানোর সময় কৌশল করা অংশটিকে সুকৌশলে ঢেকে তোমার প্যান্টের পকেট থেকে চামচটিকে বের করে আন। একদম সাধারণ ভঙিমায় দর্শকদের বোঝানোর চেষ্টা করো চামচটি নেহাতই সাধারণ। এবার চিত্র-৩ এর মতো করে চামচটির কৌশল করা অংশটি তোমার ডান হাতের তিন আঙুলের সাহায্যে খুব সাধারণভাবে ধরে নেওয়ার চেষ্টা করো।

নাও, এবার তোমার অভিনয় আর তোমার বুদ্ধির জোরে এগিয়ে যেতে থাক আর চেষ্টা করো জাদুটির সুন্দর একটি পরিসমাপ্তি দেওয়ার জন্য।

হাঁটতে জানে পয়সাও...

জাদুকে আমরা নিজের অজান্তেই কখনো কখনো অলৌকিক কিছু বলে ভেবে থাকি। অলৌকিকতার মোড়কে এই যে জাদু, তোমরা জান কি-এর পুরোটা জুড়েই কিন্তু বিজ্ঞান। আর বাদ বাকি যা, তা হলো জাদুকরের বুদ্ধিমত্তা, বাগপটুতা আর অভিনয়।

আজকের জাদু

দুটো দেশলাই বক্স, দুটোই সাধারণ। তবে এর কোনোটির ভেতরেই কাঠি নেই, একদম ফাঁকা। জাদুকর এবার তার দর্শকদের কাছ থেকে একটা কয়েন অর্থাৎ ধাতব মুদ্রা চেয়ে নিলেন। দর্শকদের যে কারোরই স্বাক্ষর নিয়ে নিলেন তাতে। সেটাকে তিনি এবারে দর্শকদের দেখিয়েই রেখে দিলেন যে কোনো খালি একটা দেশলাই বক্সের ভেতর এবং দর্শকদের বললেন তারা যেন ভালোভাবে খেয়াল রাখেন কোন বক্সটিতে কয়েনটি রাখা হলো। এবারে জাদুকর দু'টো বক্সকেই মুখোমুখি করে একত্র করে রাখলেন। বিড় বিড় করে বললেন, 'ইলি ইলি, গিলি, গিলি। হোকাস ফোকাস। এ্যাবড়া কা ড্যাবড়া। ছুমন্তর-ছু।' এরপর কেমন বিচিত্র ভঙ্গিতে হাত নাড়ালেন তিনি। ধীরে ধীরে কয়েন রাখা বক্সটিকে খুললেন। অবাক ব্যাপার-কয়েনটি তার মধ্যে নেই! বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতেই তিনি এবার খুললেন দ্বিতীয় বক্সটি, যেটি ছিল ফাঁকা। কীভাবে সম্ভব? দ্বিতীয় ফাঁকা বক্সটিতেই জাদুর কোনো মন্ত্র বলে দর্শকদের স্বাক্ষর করা কয়েনটিই অবলীলায় চলে এল।

তবুও তো কৌশল

জানি, সাথে দেওয়া ছবিগুলো দেখেই তোমরা সহজে আঁচ করে নিতে পেরেছ ব্যাপারটি। তবুও বলি, শোন...

দুদুটো খালি দেশলাই বক্স জোগাড় করে নাও এই জাদুটি দেখানোর জন্যে। চিত্র-২ অনুযায়ী বক্স দুটোর ড্রয়ারগুলোর ঠিক নীচে যে-কোনো একদিকটায় কয়েন আসা-যাওয়া করতে পারার মতো করে খাঁজ কেটে নাও। চিত্র-১ দেখ, ঠিক সেইমত। এবার যে-কোনো বক্সেই কয়েনটি রাখ না কেন, ঠিক খালি বক্সটির খাঁজ কাটা অংশের সাথে কয়েন রাখা বক্সটির খাঁজ কাটা অংশটি মুখোমুখি করে রাখ। রাখার সময় সাধারণভাবে না রেখে যদি একটু ঝাঁকিয়ে রাখতে পার, তবে তুমি নিজেই অনুভব করবে যে কয়েনটি খাঁজ কাটা ফুটো দিয়ে অন্য বাক্সে চলে গেছে। তেমনটি যদি না পারে, তবে চিত্র-৩ এর মতো করে নীচে খালি বাক্সটি এবং খাঁজ কাটা ফুটোটি মিলিয়ে উপরে কয়েন ভর্তি বক্সটি রাখ।

মন্ত্র বলা, হাত নাড়ানো–এসব কিছুই না, কার্যসিদ্ধির জন্যে কেবল তোমার অভিনয় মাত্র। যে যত ভালো করে চর্চা করবে, অভিনয় করতে পারবে–সেই হবে তত বড়ো জাদুকর।

জাদুর পরশে জেগে উঠুক সবাই। শুভকামনা তোমাদের সবার জন্যে। ■

জাদুর কবিতা

শিখবো জাদু টোনা

শেখ সালাহ্উদ্দীন

কামরূপ-কামাখ্যাতে গিয়ে শিখব জাদু টোনা
'ছু মন্তর ছু' বলে মাটি বানিয়ে দেবো সোনা
আর তা সবই বিলিয়ে দেবো দরিদ্রদের মাঝে
দেখি কে দেয় বাধা আমার কাজে?
যখন তখন নেড়ে জাদুর কাঠি
মজার খাদ্যে ভরে দেবো অনাহারীর বাটি।

মন্তর পড়ে অন্ধের চোখে ছুঁইয়ে আমার হাত
এনে দেবো আলো, মুছে সকল আঁধার রাত।
এক মন্তরে বিকল হবে ঘাতকের সব অস্ত্র
পাতা হবে মন্ত্র গুণে শীতার্তদের বস্ত্র।

ভাবতে পারো কেমন কঠিন হবে আমার জাদু?
মন্তর পড়ে দু' লোককে বানিয়ে দেবো সাধু।

তোমরা জানি কষ্টে আছো ইশকুল ব্যাগের ভারে
দিন যত যায় ওটার সাইজ এবং ওজন বাড়ে
আমি আছি, ভাবছ কেন অত?
ওটার সাইজ-ওজন হবে মানিব্যাগের মতো।

বিকেল ছোটো খেলার জন্য? বিষণ্ন তাই মনটা?
ঠিক আছে যাও, বাড়িয়ে দেবো বিকেল কয়েক ঘণ্টা।
আমার জন্য একটুখানি দোয়া রেখো, যাতে—
খুব শিগগিরই যেতে পারি কামরূপ-কামাখ্যাতে।

জাদুকর দাদু

এস এম তিতুমীর

হাতের ভিতর ফুল দিয়ে কয়,ধর্
এবার, হাতের মুঠো একটু আলগা কর্
ও মা একি ! ফুল হয়ে যায় ডানা-ওয়ালা-
সফেদ কবুতর !
আবার কয়—এই যে টিনের বাক্স, ওপর-নিচে খোলা
এর ভিতরে যা ঢুইকা যা অই পিচ্চি পোলা।

বিষম লাগে চোখে-মুখে, কি জানি কি হয়
জাদুর লাঠি ঘুরিয়ে দাদু, দূর করে সব ভয়।

বাক্স থেকে বেরিয়ে দেখি, আমি তো নেই আমি
খড়গোশ ছানা হয়ে গেছি ,গায়ে জামা দামি।

সবাই খুশি হাততালি দেয় কয় দারুণ! দারুণ!
কয় যে দাদু, সবাই এবার হাতের মুঠটি ছাড়ুন।

থির হয়ে সব চোখের পাতা, ঘোরে ঘেরা মগজ
রুপোর চামুচ হাত-পরশে, হচ্ছে কেমন কাগজ।

সাইকেল চালায় টিয়াপাখি, খাঁচার কেয়ার ছাড়া
ঢাকলে তাকে রুমাল দিয়ে, হয় যে পাখি খাড়া।

কয় যে কথা শুদ্ধ ভাষায় সালাম দিতেও জানে
রুমাল নিয়েই নাচছে পাখি জাদুর গানে গানে।

অমনি শুনি ধপ্! বাক্স থেকে বেরিয়ে বিড়াল
ধরছে পাখি খপ্। এটাও ছিল জাদু-
কইলো শেষে দাদু। এবার তবে ওঠ্
দু'হাত ভরে এই নে দাদু বিলাতি বিস্কুট

হয় মনে ভয় তো -এটাও, জাদু নয়তো ?

বিশ্বখ্যাত জাদুকর

আহমাদ স্বাধীন

ছোটো-বড়ো সকলের অপার এক বিস্ময়ের নাম জাদু! জাদুতে মুগ্ধ নয় এমন লোকের দেখা পাওয়া যাবে না। জাদু নিয়ে যারা চর্চা করছেন নিয়মিত। যাদের বিস্ময়কর কারিশমায় অবাক চোখে চেয়ে থাকি আমরা, সেই জাদুকর বা ম্যাজিশিয়ানদের নিয়েই এই লেখা।

এখানে কয়েকজন বিশ্ববিখ্যাত জাদুকরদের সাথে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দেবো।

ডেভিড কপারফিল্ড

ব্যবসায়িক দিক থেকে তিনি ইতিহাসের সবচেয়ে সফল জাদুকর ডেভিড কপারফিল্ড। ১৯৫৬ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর জন্ম নেওয়া আমেরিকান এই জাদুকর পেশাগত ক্ষেত্রে দারুণ খ্যাতি অর্জন করেছেন। গল্প বলা এবং মোহ সৃষ্টি করা, এই দুটি কাজের দুর্দান্ত সমন্বয় তাকে শতাব্দীর সেরা জাদুকরদের তালিকায় ঠাঁই দিয়েছে অবলীলায়। বিশ্ব জুড়ে রয়েছে কপারফিল্ডের কোটি কোটি ভক্ত। তার জাদু মুগ্ধ করে সবাইকে। সব জাদুর মধ্যেই একটা ট্রিক্স থাকে। কিন্তু এই জাদুকরের ট্রিক্স-এর ক্ষেত্রে কেউই সমাধানে পৌঁছাতে পারেনি। এজন্যই কপারফিল্ড বিশ্বজুড়ে সবার আগ্রহে পরিণত হন। তার বিখ্যাত জাদুর খেলার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে চীনের দেয়াল ভেদ করা। যা অকল্পনীয় একটি ব্যাপার। আরো একটা আছে যা 'ডেভিড কপারফিল্ড ডেথ স্য' নামে বিখ্যাত। এটি দেখে সাধারণ মানুষত হার্টফেল করতে পারে। এখানে একটি ইলেক্ট্রিক করাত ব্যবহার করে নিজেকে দুই ভাগ করে ফেলে কপারফিল্ড এবং আবার নিজেকে জোড়া দেন। সবার চোখের সামনে এ কাজ করেন কপারফিল্ড। আরো মজার মজার জাদু আছে তার যেখানে ডেভিড কপারফিল্ড উড়ে বেড়ায়, মাঝে একজন দর্শককেও সঙ্গে নেয়।

তার দাদা একবার ডেভিডকে তাসের কার্ড দিয়ে জাদু দেখাচ্ছিলেন। তখন ডেভিডের বয়স মাত্র সাত। ছোটোবেলা থেকেই অত্যন্ত অসহায়ত্বের মধ্যে কেটেছে ডেভিডের জীবন। মূলত সামাজিকভাবে নিজেকে উপর সারিতে নিয়ে যাওয়ার জন্যই ডেভিড জাদুশিল্পে মনোনিবেশ করেন। তিনি যখন জাদু শিখছিলেন এবং মানুষকে দেখানো শুরু করলেন ঠিক সে মুহূর্ত থেকেই সবাই তাকে আলাদা চোখে চিনতে শুরু করে। বিষয়টা ডেভিডকে অন্যরকম অনুভূতি এনে দেয়। অনেকেই মনে করেন তিনি ডাকিনি চর্চা (ভুডো) কিংবা কিছু একটা করেন যার সহায়তায় এসব কিছু হয়। তাদের দাবি ডেভিড কপারফিল্ডের ভিতর নিশ্চয়ই অলৌকিক কিছু একটা আছে যা ডেভিড কখনোই প্রকাশ করেননি। কপারফিল্ড তার ৪০ বছরের ক্যারিয়ারে ১১ বার গিনেস বিশ্ব রেকর্ডে নাম লিখিয়েছেন। এ পর্যন্ত তার জাদু প্রদর্শনীর টিকেট বিক্রি হয়েছে প্রায় ৩৩ মিলিয়ন এবং তা থেকে কপারফিল্ডের আয় হয়েছে ৪ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি!

ডায়নামো

মঞ্চে তিনি ভক্তদের কাছে 'ডায়নামো' নামে পরিচিত হলেও তার প্রকৃত নাম স্টিভেন ফ্রেয়ন।

১৯৮২ সালের ১৭ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করা ইংলিশ এই জাদুকর তার টেলিভিশন শো 'ডায়নামো: ম্যাজিশিয়ান ইম্পসিবল' দিয়ে দর্শকদের মন জয় করেন। ২০১১ সালের জুলাই মাসে চালু হয়ে ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শেষ হওয়া শোটি মাত্র ৩৫ বছর বয়সেই তাকে শতাব্দীর সেরা জাদুকরদের তালিকায় স্থান করে দিয়েছে। ছোটোবেলা থেকেই 'ক্রনিক ডিজিজ' নামক একটি ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ায় শারীরিক গঠনের দিক থেকে তিনি বেশ ছোটোখাটো ছিলেন। কাজেই অন্যান্য বাচ্চারা তাকে নিয়ে দুষ্টুমি করত প্রায়ই। তার দাদু তখন তাকে একটি মজার কৌশল শিখিয়ে দেন, যাতে বাকি বাচ্চাদের মনে হয় ফ্রেয়নের ওজন অনেক বেশি। সেই থেকে জাদুর জগতে তার হাতেখড়ি। টেমস নদীর উপর দিয়ে হেঁটে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেন তিনি এই জাদুকরের বার্ষিক আয় প্রায় ১৯ মিলিয়ন ডলার। জাদু শিখতে ভ্রমণ করেছেন মার্কিন মুল্লুকের নিউ ওরলিয়ন্স ও লুইজিয়ানায়। আর জাদুবিদ্যার এ পীঠস্থানেই নিজেকে একজন পরিণত জাদুশিল্পী বানিয়েছেন। আর নিজের কাজকে বহুমাত্রিকতা দিতে শিখেছেন নৃত্যের কলাকৌশল। তার নৃত্যে যোগ হয়েছে আধুনিকতম সংস্করণ হিপ হপ। একজন পেশাদার জাদুশিল্পী হিসেবে মঞ্চে পরিবেশন শুরু করেন ২০০২ সাল থেকে। ডায়নামো বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্য বিনামূল্যে জাদু পরিবেশন করে তহবিল গঠনে সাহায্য করে থাকেন।

ক্রিস অ্যাঞ্জেল

ছোটোবেলায় জাদুকরদের কাছ থেকে দূরে থাকতে চাইতেন যেই জাদুকর, তার নাম ক্রিস্টোফার নিকোলাস সারানটাকোস।

জন্মের সময় বাবা-মা প্রদত্ত এই নামটি মঞ্চ কাঁপানো ভোজবাজির রাজা 'ক্রিস অ্যাঞ্জেল'-এর আড়ালে চাপা পড়ে গেছে অনেক আগেই। ১৯৬৭ সালের ১৯শে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করা ৫০ বছর বয়েসি এই আমেরিকান জাদুকর তার ক্যারিয়ার শুরু করেন নিউইয়র্ক শহরে। মাত্র সাত বছর বয়সে জাদুর জগতের

প্রতি আগ্রহ তৈরি হয় ক্রিসের। জীবনের প্রথম স্টেজ শোতে অংশ নেন বারো বছর বয়সে। সেই শো থেকে কামিয়েছিলেন দশ ডলার। বিশ্বসেরা জাদুকর হ্যারি হুডিনিকে দেখে অনুপ্রাণিত হওয়া বালক জাদুকর হাই স্কুলের চারপাশে যেসব রেস্তোরাঁ ছিল, সেখানে জাদু দেখানো শুরু করে। ক্রিসের প্রথম নজরকাড়া জাদু ছিল নিজের মাকে কিছুক্ষণ হাওয়ায় ভাসিয়ে রাখা।

'ক্রিস অ্যাঞ্জেল মাইন্ডফ্রিকষ্ট' নামক টেলিভিশন এবং স্টেজ শোর মধ্য দিয়ে তিনি দর্শকদের নজরে আসেন।

২০০২ সালে নিউইয়র্ক টাইমস স্কয়ারে একটি টেলিফোন বুথ আকৃতির চৌবাচ্চায় নিজেকে প্রায় ১২ ঘণ্টা আটকে রেখে চমকে দেন দর্শকদের। অন্যান্য জাদুকরদের তুলনায় টেলিভিশন প্রাইম টাইমে তার উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। এবিসি টেলিভিশনে প্রায় একঘণ্টা ব্যাপী একটি শো পরিচালনা করতেন তিনি, অনুষ্ঠানটির নাম ছিল 'সিক্রেটস'। অসংখ্য বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী এই জাদুশিল্পী ২০০৯ সালে 'দশকের সেরা জাদুকর' উপাধিপ্রাপ্ত। ক্রিস অ্যাঞ্জেল 'মাইন্ডফ্রিক: সিক্রেট রেভেলেশনস' নামক একটি বইও রচনা করেন।

ডেভিড ব্লেইন

সব থেকে ধৈর্যশীল জাদুশিল্পী ডেভিড ব্লেইন হোয়াইট, যিনি ডেভিড ব্লেইন নামেই অধিক পরিচিত, আমেরিকান এক জাদুকর, ধৈর্যের জন্যই তিনি বেশি বিখ্যাত এবং এক্ষেত্রে একাধিক বিশ্বরেকর্ড ভাঙার রেকর্ডও রয়েছে তার! টেলিভিশনে যেভাবে জাদুবিদ্যা উপস্থাপন করা হয়, সেখানে বেশ বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনেন ব্লেইন। জাদু দেখে দর্শকদের কী প্রতিক্রিয়া হয়, সেটা দেখানোই ছিল তার প্রধান লক্ষ্য। পারফর্মারের বদলে দর্শকসারিতে বার বার ক্যামেরা ঘুরিয়ে তিনি দর্শকের প্রতিক্রিয়া দেখানোর নতুন এক পদ্ধতি প্রচলন করেন।

দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমের মতে, 'শত বছরের পুরনো এবং গৎ বাঁধা একটি ধারা থেকে বের হয়ে এসে ব্লেইন দর্শককে এমন একটি অনুভূতির সাথে পরিচিত করিয়েছেন, যা তাকে আরো শত বছর লোকমুখে বাঁচিয়ে রাখবে। একেবারেই অভিনব এই ধারণাটি সত্যিই প্রশংসনীয়। নিজের প্রচারণার জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে তিনি জাদুবিদ্যারই ব্র্যান্ডিং করে চলেছেন। অপর এক খ্যাতনামা জাদুকর প্যান জিলেট বলেন ব্লেইনের প্রথম টেলিভিশন শো 'স্ট্রিট ম্যাজিকষ্ট' দেখে বলেছিলেন, 'আমাদের জীবদ্দশায় টেলিভিশন ম্যাজিকের জগতে সবচেয়ে বড়ো অর্জন এটি'। সরাসরি একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা দর্শকরা চোখের সামনে ঘটতে দেখা একের পর এক বিভ্রমকে কীভাবে গ্রহণ করছেন, তা দেখিয়েই দর্শকের মন কেড়ে নিয়েছেন ব্লেইন। ■

জাদুর নিবন্ধ

বিজ্ঞানের জাদু

শামস্ নূর

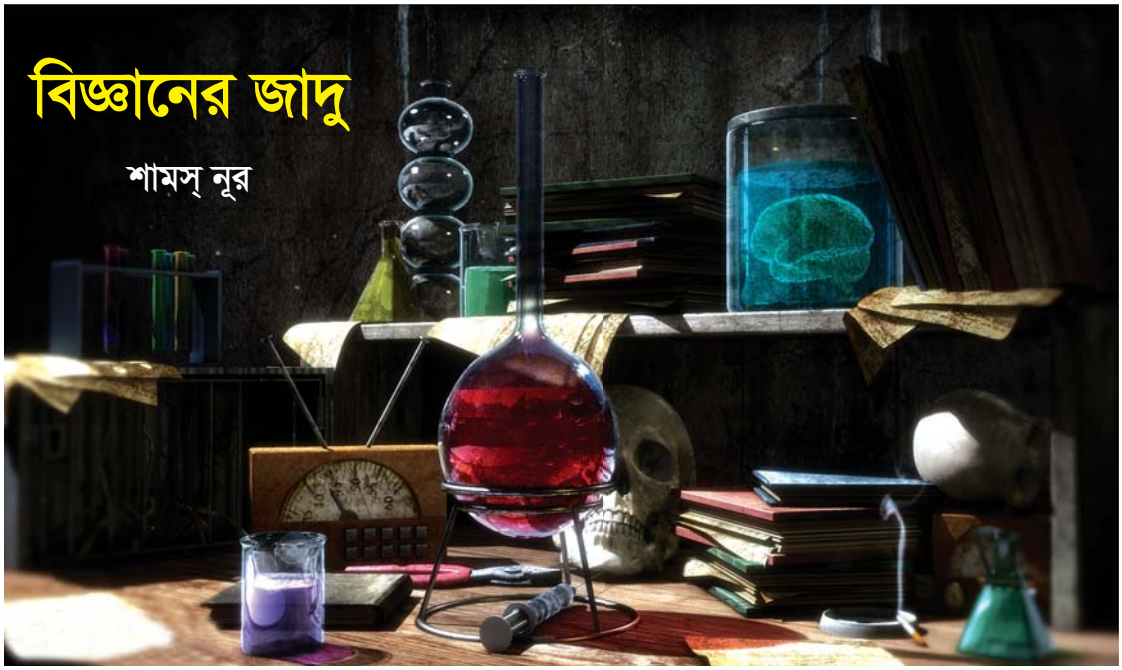

বাংলায় 'জাদু' আর ইংরেজিতে Magic (ম্যাজিক)। 'জাদু' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ দাঁড়ায়—'ভেলকিষ্ট, 'ইন্দ্রজাল', 'ভোজবাজি', 'আকর্ষণ' প্রভৃতি। আর বিজ্ঞান (Science) শব্দটির প্রতিশব্দ দাঁড়ায় 'বিশেষ জ্ঞান', 'বিশেষ বিদ্যা', 'বিশেষ বুদ্ধি', বা 'পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে অর্জিত যে জ্ঞান'। জাদু ও বিজ্ঞান পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। জাদুর মাঝে যেমন বিজ্ঞান রয়েছে তেমনি বিজ্ঞানের মাঝে জাদু বা জাদুকরী সব ব্যাপারের উপস্থিতি দেখা যায়। জাদুর মাধ্যমে জাদুকর বুদ্ধি বা কৌশলের আশ্রয় নেন। আর তা দিয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলেন, অবিশ্বাসকে বিশ্বাসযোগ্য করে মানুষের সামনে উপস্থাপন করেন। যা দেখে মানুষ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। অন্যদিকে বিজ্ঞান বিস্ময়কর কোনো কিছু সৃষ্টি করে কিংবা সাধারণ কিছুর মাঝে অসাধারণ কিছুর খোঁজ পায় যার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। জাদুর মাধ্যমে প্রকৃত জিনিসকে আড়াল করার একটা ব্যাপার থাকে। কিন্তু, বিজ্ঞানের মাধ্যমে প্রকৃত বিষয়কে প্রকাশ করার ব্যাপার থাকে।

বিজ্ঞানের সঙ্গে বুদ্ধি, ব্যাখ্যা, বিচারবিবেচনা, বিশ্লেষণ, বাস্তবতা প্রভৃতি বিষয়গুলো অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যুগ যুগ ধরে নানাবিধ গবেষণার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানই হলো বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের জাদুকরী সব আবিষ্কার মানুষের জীবনযাত্রাকে সহজ করে তুলেছে, দূরকে করেছে নিকট, অসাধ্যকে নিয়ে এসেছে মানুষের সাধ্যের মধ্যে। যে জিনিসের বাস্তবসম্মত কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, বিজ্ঞানের কাজই হলো সেই জিনিসের প্রকৃত ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করা। যে জিনিসের বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা নেই, সেই জিনিস নিয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত দাঁড় করিয়েই বিজ্ঞান সার্থকতা লাভ করেছে। অমীমাংসিত জিনিসের বাস্তবসম্মত এক মীমাংসায় পৌঁছে বিজ্ঞান সমৃদ্ধি লাভ করেছে। সবকিছুর নামে একটি বাস্তব, যৌক্তিক, লৌকিক ও সঠিক সত্যের ব্যাখ্যা প্রদান করাই হলো বিজ্ঞানের কাজ।

অন্যদিকে জাদুর সঙ্গে বুদ্ধির উপস্থিতি থাকলেও তাতে কৌশল, ভেলকি, চতুরতা, চালাকি, চাতুর্য বিষয়গুলোর প্রত্যক্ষ উপস্থিতি থাকে। বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের সমন্বয় ঘটিয়েই ম্যাজিশিয়ান বা জাদুকরেরা সবকিছু করে থাকেন। কথায় বলে, 'যে ম্যাজিক জানে, সে খুব চালাক।' কথাটি যে মোটেই সঠিক নয় তা নিশ্চিত করে বলা যায়। বিশ্ববিখ্যাত জাদুশিল্পী ডেভিড কপারফিল্ড, ভারতের প্রখ্যাত জাদুসম্রাট পি.সি. সরকার, পি.সি. সরকার (জুনিয়র), বাংলাদেশের খ্যাতনামা জাদুশিল্পী জুয়েল আইচ জাদু দেখিয়ে দেশ-বিদেশে খ্যাতি,

মর্যাদা ও অর্থ লাভ করেছেন। বর্তমান এই বিজ্ঞান-প্রযুক্তির চরম ও পরম উৎকর্ষের যুগেও ম্যাজিক বা জাদু খুব জনপ্রিয়। শিশু থেকে শুরু করে কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার কাছে জাদু অত্যন্ত কৌতূহল, আনন্দ, আগ্রহ আর মজার এক ব্যাপার। জাদুকে আরো আকর্ষণীয় করে আরো বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে বিজ্ঞান নির্ভর বিভিন্ন খেলা। ইন্টারনেট, ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটারের প্রবল প্রভাব আর দাপটের এই যুগে মোটেও পিছিয়ে নেই জাদুকরেরা। তারাও যুগের আর প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ক্রমাগত বদলে চলেছেন জাদু ও জাদুবিদ্যার ধরন, কৌশল ও প্রকাশভঙ্গি।

বিজ্ঞানীদের মতে, 'জাদু' শব্দটি বেশ কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। প্রধানত তিনটি ক্ষেত্রে এই শব্দটি বেশি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই তিন ক্ষেত্র হলো– অতিপ্রাকৃত জাদু বা অলৌকিক জাদু, কাব্যিক জাদু এবং পেশাদার জাদুকরের জাদু। এই তিনটি জাদু ছাড়াও আমরা আরো দু'একটি জাদু সম্পর্কে বলবার চেষ্টা করব। আর এর পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক ও বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা কী রয়েছে তা অনুসন্ধানের চেষ্টা করব।

অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত জাদু

পৌরাণিক কাহিনি, রূপকথার গল্প এছাড়া আরো কোনো কোনো গ্রন্থে অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত জাদুর খোঁজ পাওয়া যায়। আবার অবাস্তব কোনো ঘটনার মাঝেও এ ধরনের জাদুর দেখা মেলে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়– 'সিন্ডারেলা'র সেই রূপকথার গল্পের কথা। গল্পে জাদুর বুড়ি তার হাতের জাদুর কাঠির ছোঁয়ায় কুমড়াকে পালকি কিংবা গাড়ি বানিয়ে ফেলে। আবার গিরগিটিকে মানুষের রূপ ধারণ করিয়ে গাড়ির চালক বানিয়ে ফেলে। কখনো বা ইঁদুরকে বানিয়ে ফেলে ঘোড়া বা রাজপুত্রকে ব্যাঙে পরিণত করে। উদাহরণ হিসেবে আরো আনা যায় –আলাদিনের জাদুর দৈত্যের কথা। একটি বিশেষ চেরাগকে ঘষে দিলেই তা থেকে বিশালাকার এক দৈত্য বেরিয়ে আসে। চোখের পলকে সে আলাদিনের হুকুম পালন করে। কিংবা জাদুর পাটিতে চড়ে তড়িৎ গতিতে যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে আরো আনা যায় – আলিবাবা ও চল্লিশ চোরের গল্প। যেখানে 'খুলে যা সিমসিম' বললেই পাহাড় দুই দিকে সরে গিয়ে রাস্তা বানিয়ে ফেলে।

রূপকথার গল্প ছোটোদের একটি প্রিয় বিষয়। যা শুনে বড়োরাও মুগ্ধ হন। কিন্তু তারা জানেন, এই গল্পগুলোর কোনোটিই বাস্তব নয়। অর্থাৎ বাস্তবতাকে ভিত্তি করে গল্পগুলো লেখা হয়নি। রূপকথার গল্পগুলো লোকমুখে কিংবা বইয়ের পাতায় প্রচলিত আছে। বাস্তবে এরকম ঘটনা ঘটার কোনো সম্ভাবনা বা ঘটার যৌক্তিক কোনো কারণ নেই। বর্তমান বিজ্ঞানের এই যুগে রূপকথার গল্পের অবাস্তব ও অলৌকিক ব্যাখ্যা কারো কাছেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। জাদুর কাঠির ছোঁয়ায় কুমড়া হয়ে যাচ্ছে পালকি কিংবা গাড়ি, গিরগিটি হয়ে যাচ্ছে মানুষ কিংবা রাজপুত্র পরিণত হচ্ছে ব্যাঙে; অন্যদিকে চেরাগ ঘষলেই দৈত্য আসছে, চোখের পলকে হুকুম পালন করছে, 'খুলে যা সিমসিম' বললেই পাহাড় দুদিকে সরে যাচ্ছে–এসব গল্পগুলো উর্বর কল্পনাপ্রসূত এবং সাধারণ মানুষের কাছে হৃদয়গ্রাহী তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু স্বাভাবিক জ্ঞান বলে এসব ঘটনা বাস্তবে অসম্ভব। এর কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। বাস্তবে এমনটি কোনোক্রমে হতেই পারে না, হয়ও না।

কাব্যিক জাদু

দ্বিতীয় যে জাদুর কথায় আসছি তার নাম কাব্যিক জাদু। কোনো কোনো বিজ্ঞানীদের মতে, এটিকে বলা যায় সবচেয়ে চমৎকার জাদু। সুমধুর কোনো সুর বা ছন্দ শুনে আমরা আবেগপ্রবণ না হয়ে পারি না। যা আমাদের মন-প্রাণ ভরিয়ে তোলে, আমরা চলে যাই জাদুময় এক জগতে। এ প্রসঙ্গে আরো বলা যায়, অপরূপ কোনো দৃশ্য বা প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে আমরা যেমন নিজ অজান্তেই বলে উঠি– প্রকৃতিটা কী চমৎকার, জাদুময়! সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য আমাদেরকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। পর্যটক হিসেবে আমরা যেমন নতুন নতুন দৃশ্যপটের সৌন্দর্য উপভোগ করি, অন্যদিকে প্রাকৃতিক দৃশ্যপট নিয়ে আঁকা ছবিও চিরকাল অপার বিস্ময়ে দেখি। সব দেশের, সব কালের, সব সংস্কৃতির মানুষের কাছে আদর্শ বাসস্থানের আকাঙ্ক্ষা প্রায়ই একই রকম। মানুষ চায় বৃক্ষ সুশোভিত অঞ্চল, শান্ত জলাশয়, গাছে গাছে পাখির গান, প্রাণীর চারণ প্রভৃতি। এসবই মানুষের পছন্দ। যুগে যুগে শিল্পীরা নিপুণ তুলিতে ফুটিয়ে তুলেছেন এরকম আদর্শ প্রাকৃতিক দৃশ্যের মনোমুগ্ধকর কত ছবি! চাঁদহীন রাতে তারারা খুব উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে। এমনই এক বর্ষা রাতে কোনো এক শান্ত সুনিবিড় গ্রামের স্বচ্ছ পানির ঝিলে নৌকা ভাসিয়ে, নৌকার পাটাতনে শুয়ে পরিষ্কার ও চাঁদবিহীন আকাশের তারা গুনছ! এমন সৌন্দর্য যে কাউকে মুগ্ধ করবে। ওপরের বিভিন্ন প্রাকৃতিক বর্ণনার মাঝে এক জাদুময়তা যে-কারো ক্ষেত্রে কাজ করে। এ জাদুময়তাকেই কাব্যিক জাদু বলা হচ্ছে।

বিজ্ঞানের ভাষায় মানুষের এই প্রকৃতি প্রীতিকে বলা হয় বায়োফিলিয়া বা জীবপ্রেম। ভূ-প্রকৃতি, গাছপালা, জীবজন্তুর প্রতি একটি সহজাত আকর্ষণ, যা কেবল প্রয়োজনের খাতিরে নয়। এই প্রকৃতিপ্রেম বা জীবপ্রেমটি বিবর্তনের সূত্রে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পেয়েছি। বৃক্ষ সুশোভিত, পশুপাখি আর জলাশয় সমৃদ্ধ ওই তৃণভূমিই যেদিন খাদ্য, আশ্রয়, আত্মরক্ষা– সব দিক থেকে টিকে থাকার সহায়ক ছিল। কাজেই আমাদের মস্তিষ্ক তখন থেকেই এমনই দৃশ্যপটকে আদর্শ মনে করেছে, ভালোবাসতে শিখেছে। এই তত্ত্বকে বলা যেতে পারে সাভানা তত্ত্ব।

জাদুকরের জাদু

এবার আসা যাক মঞ্চে দেখানো জাদুকরের জাদু প্রসঙ্গে। একজন জাদুকর শত শত দর্শকদের অবাক করিয়ে যে জাদু দেখিয়ে থাকেন। জাদুকরেরা তাদের জাদু এমনভাবে উপস্থাপন করেন যেন তা সত্যি সত্যি বাস্তবে ঘটছে। শিশু থেকে বয়স্ক পর্যন্ত সবার কাছে এসব জাদু খুবই আনন্দদায়ক ও মজাদার এক ব্যাপার। শত শত দর্শকের সামনে এ জাদু এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় তা যেন 'সত্যিই ঘটছে'। কিন্তু, এ জাদুর আড়ালে রয়েছে অন্যরকম কোনো বাস্তবতা। জাদুবিদ্যার কঠিন সমালোচকদের মতে, মঞ্চে পারফরমেন্স দেখানো কোনো জাদুকর তার জাদুর মাধ্যমে দর্শকদের এমন তাক লাগানোর মাধ্যমে মূলত এক ধরনের প্রতারণার খেলা খেলে থাকেন। মাঝে মাঝে এমনও মনে হয় তারা যেন প্রকৃতির নিয়মের বাইরে গিয়ে অলৌকিক কিছু একটা করে ফেলেছেন।

কিন্তু এই জাদু রহস্য আমরা যদি উদ্‌ঘাটন করতে যাই তাহলে দেখা যাবে– এ ধরনের ঘটনার পেছনে রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান বা অন্য কোনো ছলচাতুরীর বাস্তব কোনো কৌশল লুকিয়ে থাকে। দর্শকরা এই কৌশল সম্পর্কে অবগত থাকেন না বলে জাদুকরের এই পারফরমেন্স তাদের কাছে জাদু বলে মনে হয়। জাদুর একটি রুমাল হাতে নিয়ে মন্ত্র পড়তে পড়তে তার ভেতর থেকে একটি কবুতর বের করে আনলো, আর দর্শক যারা ছিল তারা মুগ্ধ হয়ে হাততালির শব্দে চারপাশ কাঁপিয়ে তুললো। কিন্তু বাস্তবতা হলো রুমাল বা কাপড়ের টুকরা থেকে কোনো কারণ ছাড়া একটি

কবুতরে পরিণত হতে পারে না। অর্থাৎ, প্রাণহীন কোনো বস্তুতে কখনো মন্ত্র পড়ে প্রাণ আনা যায় না। জাদুকর এটি সম্ভব করে তোলে বিশেষ কৌশলে। মন্ত্র পড়তে পড়তে, হাত নাড়তে নাড়তে বা অন্য কোনো কৌশলে দর্শকদের মনোযোগ তখন রুমালের দিকে থাকে না, থাকে জাদুকরের মন্ত্র পড়া কিংবা হাতের দিকে। সে সময় রুমাল থেকে কবুতর কীভাবে রূপান্তরিত হচ্ছে সেটার দিকে দর্শকের মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না।

জাদুকরের আরেক দল আছে যারা মৃত আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে বলে দাবি করে। কিন্তু বাস্তবে কী এ ধরনের ঘটনা ঘটা আদৌ সম্ভব? এ ধরনের জাদুকর দাবিকারী লোকেরা যখন মৃত আত্মার সঙ্গে যোগাযোগের কথা বলে তখন তা হাসির খোরাক বলে বিবেচিত হয়। বেশিরভাগ মানুষের কাছে এ ধরনের ঘটনা বিশ্বাস করার যৌক্তিক কোনো কারণ থাকে না। তবে কোনো কোনো মানুষ সত্যি সত্যি বিশ্বাস করে এই লোকেরা মৃত আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। এইসব লোকেরা এগুলোর নামে স্রেফ প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে থাকে।

বুদ্ধির জাদু

মানুষের উপস্থিত বুদ্ধি যে বুদ্ধির জাদু হিসেবে ধরা দিতে পারে নিচের দুইটি ঘটনা তা-ই প্রমাণ করবে। তবে দেখা যাক নিচের দুইটি ঘটনার মধ্যে কী ধরনের বুদ্ধির জাদু লুকিয়ে আছে–

ঘটনা: ১

এক ভদ্রলোক তার ওপরওয়ালার কাছে আগাম ছুটির দরখাস্ত দিয়েছেন। দরখাস্তে তিনি জানিয়েছেন যে, দরখাস্তের তারিখ থেকে পনেরো দিন পরে সকাল সাতটায় তার বাবা মারা যাবেন। তিনি তাঁর পিতার মৃত্যু-সময়ে পিতার কাছে থাকতে চান। সে কারণে তার এই দরখাস্ত। তার এই আবেদন যেন সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হয় এবং ওই দিন যেন তাকে অবশ্যই ছুটি মঞ্জুর করা হয়।

এমনিতে ওই অফিসে ছুটির ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি। কর্তৃপক্ষ সহজে কাউকে আগাম ছুটি মঞ্জুর করেন না। কিন্তু কর্মচারীটির এই চিঠি পড়ে ছুটি মঞ্জুর কর্মকর্তার মন গলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ছুটি মঞ্জুর করে দিলেন।

কিন্তু কেন? কারণ, আবেদনকারী তার পিতার মৃত্যুর সঠিক তারিখ এবং সময় পনেরো দিন আগে কী করে জানতে পারলেন? তাকে ছুটি-ই বা মঞ্জুর করা হলো কেন?

বাস্তবতা হলো, আবেদনকারীর বাবা ছিলেন ফাঁসির আসামি। তার ফাঁসির তারিখ এবং নির্ধারিত সময় আদালত আগেই ঘোষণা করেছিলেন।

এমন মর্মান্তিক অবস্থায় মানবিক আবেদনে কর্তৃপক্ষ কখনো সাড়া না দিয়ে থাকতে পারেন? তাই আবেদনকারীকে ছুটি মঞ্জুর করতেই হয়েছিল।

ঘটনা : ২

এক বইয়ের দোকানে চুরি হয়েছে। দারোগা তাঁর অধীনস্থ এক সাব-ইন্সপেক্টরকে পাঠালেন তদন্তে। সাব-ইন্সপেক্টর এসে রিপোর্ট দিলেন। তাতে অন্য সব তথ্যের সঙ্গে তিনি লিখলেন, 'দোকানের বাইরের শোকেসে একটাই মাত্র বই পড়েছিল বাইবেল। পাপ হবে ভেবে চোর হয়ত সেটা চুরি করেনি। বইটা খোলা অবস্থায় পড়ে ছিল শোকেসের তাকে। বইয়ের মুখোমুখি যে দুই পৃষ্ঠা খোলা ছিল তাদের পৃষ্ঠা সংখ্যা হলো ২১৫ এবং ২১৬। এছাড়া মেঝেতে একটা বই গড়াগড়ি খাচ্ছিল। সেটা হলো লিও তলস্তয়ের লেখা 'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট'।

রিপোর্ট পড়ে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন দারোগা সাহেব। সাব-ইন্সপেক্টরকে বললেন, 'এটা মিথ্যে

রিপোর্ট। আপনি আদৌ ঘটনাস্থলে যাননি। বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে রিপোর্ট লিখেছেন।'

দারোগা সাহেব কিসের ভিত্তিতে একথা বললেন?

দারোগা সাহেবের সিদ্ধান্ত সঠিক দুটো কারণে।

এক. কোনো বইতেই ২১৫ এবং ২১৬ পাতা মুখোমুখি থাকতে পারে না। কারণ, সেক্ষেত্রে বইয়ের ডানদিকের পৃষ্ঠা সংখ্যা হবে জোড় সংখ্যা যা কখনোই হয় না।

দুই. লিও তলস্তয় 'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট' নামে কোনো বই লেখেননি।

পরিশেষে

পৃথিবীতে ঘটা সব ঘটনারই বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা থাকে। কোনো কোনো ঘটনার রহস্য হয়ত তাৎক্ষণিকভাবে মীমাংসা হলো না; দেখা যায় সেই রহস্যের সামাধান হতে কয়েক বছর, কয়েক দশক কিংবা কয়েক শতাব্দীও লেগে যেতে পারে। অত্যাধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এত দ্রুত পরিবর্তনশীল আর এত বেশি জাদুময় যে তা পরিবর্তিত হয়েই চলেছে। এখনকার আবিষ্কারগুলো অলৌকিক বলেই মনে হয়। বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক আবিষ্কার আর অলৌকিক জাদু এখন প্রায় কাছাকাছি অবস্থানে চলে এসছে।

অতীতে কল্পবিজ্ঞান কাহিনির লেখকরা অনেক অবাস্তব বিষয় কল্পনা থেকে তাদের লেখায় তুলে ধরেছেন। পরবর্তীতে এসব কল্পনার অনেক বিষয় বাস্তবে পরিণত হয়েছে। আজকের যুগে সেসব বিষয় অসম্ভব বলে মনে হয়। ভবিষ্যতে সেগুলোই হয়ত সম্ভব হয়ে দেখা দেবে। তবে সবগুলোই যে সম্ভব হবে এমনটি নাও হতে পারে। এইসব দিকগুলো নিয়ে যে যত বেশি চিন্তা বা উপলব্ধি করতে পারবে সে দেখবে 'অলৌকিকতা' বলে জিনিসটি বাস্তবতার নিরিখে টিকছে না। প্রকৃতির প্রতি মানুষের মনোমুগ্ধকর যেমন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা রয়েছে, রয়েছে জাদুময়তার মাঝে বিজ্ঞানের উপস্থিতি। আর জাদুকরের জাদুর মাঝে যে কৌশলের আশ্রয় নেন তার পেছনে রসায়ন, পাদার্থবিজ্ঞান কিংবা অন্য কোনো কৌশল রয়েছে তা নিশ্চিত করেই বলা যায়।

বলে রাখা ভালো, যদি এমন কিছু ঘটে থাকে যা অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক বলে মনে হয় অথবা বিজ্ঞান দিয়ে যাকে ব্যাখ্যা করা যায় না– এরকম পরিস্থিতিতে বা ঘটনার খোঁজ পেলে তা দার্শনিক ডেভিড হিউমের দুটি সম্ভাবনার কোনো না কোনো একটিতে পড়বে। প্রথমত: ঘটনাটি আদৌ ঘটেনি (দর্শক ভুল দেখতে পারে বা ঘটনা সম্পর্কে মিথ্যা বলতে পারে বা ঘটনাটি কোনো কৌশল হতে পারে)। দ্বিতীয়ত: ঘটনাটি আমাদের প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের অনেক আগেই ঘটে গেছে। ভবিষ্যতে এর রহস্য উন্মোচিত হবে কিংবা এর ব্যাখ্যা আমরা জানতে পারব। ব্যতিক্রমী কিংবা অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা ঘটলে এর ব্যাখ্যার জন্য অতিপ্রাকৃত কোনো শক্তি বা সত্তার উপস্থিতি আছে এটি কোনোক্রমেই বিশ্বাস্য নয়।

সত্য আসলেই অনেক সুন্দর – যা জাদু, রূপকথা, উপকথা কিংবা অলৌকিকতাকে হার মানায়। এই সত্য, সুন্দর ও সৌন্দর্যের মূলে রয়েছে বিজ্ঞান। এটি সময় সময় আমাদের মাঝে এমনভাবে দেখা দেয় যেন মনে হয় বিজ্ঞান নিজেই অনেক জাদুময়। আর বাস্তবতার এই জাদুকেই আমরা বলতে পারি বিজ্ঞানের বিস্ময়কর জাদু। ■

জাদু

সাদিয়া নাজনীন প্রমা

জাদু তো নয় হাতসাফাই
এই আছে তো এই নাই
কেউ বলে ভেলকিবাজি
কারো কাছে চোখের ফাঁকি
জাদু দেখায় কথার ছলে
মুগ্ধ যেন মন্ত্র বলে
কারো মুখে নাই যে কথা
সবার চোখে লাগে ধাঁধা

দশম শ্রেণি, আখাউরা রেলওয়ে স্কুল

ঘরে বসেই জাদুকর হওয়ার সুযোগ

আফরোজা সুমি

জাদুকর বলতেই তোমরা নিশ্চিত একজনকে চিনো, যিনি দুরন্ত টেলিভিশনে প্রতি রবি থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ১০:৩০ মিনিটে এবং বিকেল ৫:৩০ মিনিটে 'সোনার কাঠি রূপার কাঠি' অনুষ্ঠানে নিত্যনতুন জাদু দেখিয়ে তোমাদের চমকে দেন। পেশার সূত্রে জাদুকে যেমন তিনি ভালোবাসেন, তেমনি সমান ভালোবাসেন ছোটো বন্ধুদেরও।

সারাদেশে জাদুর ফেরি করে বেড়ানো এই মানুষটির পুরো নাম রাজীব বসাক। তোমাদের সাথে মেলামেশার সুবাদে এই মানুষটিও জানেন তোমাদের মনের কথা। আর তাই তো জাদু এবং জাদুর পেছনের কৌশল নিয়ে নিয়মিতই লিখে চলেছেন দেশ-বিদেশের নানান পত্রপত্রিকায়। এবারে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তোমার বাড়িতে বসেই তোমাকে জাদুর কৌশল শেখানোর। আর তাই তো বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো তিনি তোমাদের হাতে তুলে দিতে যাচ্ছেন বারোটি জাদুর সরঞ্জামসহ দেড় ডজন জাদু নিয়ে জমজমাট এক জাদুর বাক্শো। এই বাক্সের ভেতরেই থাকছে প্রতিটি জাদুর প্রদর্শন পদ্ধতি, সরঞ্জাম তৈরির নিয়ম, পেছনের কৌশলসহ সবিস্তারে ভিডিও সিডি। আরো কত কী!

চলো তবে জেনে নেই কী কী জাদুর কৌশল আমরা শিখতে পারব এই 'জাদু'র বাক্শো' থেকে। একটা ডালে মুহূর্তেই ফুল চলে আসা, মুখ দিয়ে দুধ খেয়ে সেটাকেই আবার কান দিয়ে বের করে দেখানো, একটা চেইনের মধ্যে নিরেট একটা রিং ঢুকে যাওয়া, শূন্যে ভাসমান দেশলাই কাঠি, পয়সা অদৃশ্য করা, ডিম থেকে মুরগির বাচ্চা বানানো, খালি পাত্রে পয়সা চলে আসা, না দেখেই দর্শকদের পছন্দের সংখ্যা বলে দেওয়া, বল অদৃশ্য করে দেখানো, আজ্ঞাবহ বল, বিনা বিদ্যুতে বাতি জ্বালানোসহ মজার মজার আরো কত কী!

রহস্যের টান টান বুনিয়াদে ঠাসা এই 'জাদু'র বাক্শো'-র দাম রাখা হয়েছে মাত্র এক হাজার দুইশত টাকা। অর্ডার করলে বাড়িতে বসেই এই 'জাদু'র বাক্শো' হাতে পেয়ে যেতে পারো। এজন্যে কুরিয়ার সার্ভিস বাবদ আরো একশত টাকা যোগ হবে। অর্ডার করতে কিংবা বিস্তারিত জানতে ফোন কর ০১৭১৪-০৭০০০০ অথবা ০১৯১৯-০৭০০০০-এই নম্বরগুলোতে।

কে জানে – চর্চা আর বুদ্ধির মিশেলে তোমাদের মধ্য থেকেই কেউ হয়ে উঠতে পারো আগামী দিনের বিখ্যাত কোনো জাদুকর। ■

সাক্ষাৎকার

THE GLOBAL HAPPINESS CHALLENGE #02

যুদ্ধ নয় শান্তি চাই। দুখি চেহারার পরিবর্তে মানুষের হাসিমুখ দেখতে চাইলেন কার্টুনিস্ট মোরশেদ মিশু। আঁকলেন গ্লোবাল হ্যাপিনেজ চ্যালেঞ্জ সিরিজ। যা সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বিশ্বজুড়ে ঘুরতে ঘুরতে কার্টুনিস্ট হঠাৎ 'নবারুণ' এর মুখোমুখি। যার দিকে একগাদা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন **কাজী তাবাসসুম আহমেদ**।

নবারুণ : কীভাবে গ্লোবাল হ্যাপিনেজ চ্যালেঞ্জ সিরিজের আইডিয়া মাথায় এল?

কার্টুনিস্ট : যুদ্ধবিধস্ত যেসব দেশ বা এলাকার ছবি আমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখে আসছিলাম ২০১৮-এর শুরুর দিকে, ছবিগুলো দেখে আমার মন খারাপ হতো। রাতে ঠিকমতো ঘুম হতো না। ফেব্রুয়ারির ২৫ তারিখে হঠাৎ আইডিয়াটা মাথায় আসে। যেহেতু এ ধরনের কষ্টকর ছবি আমি দেখতে চাই না, আমি দেখতে চাই মানুষের হাসিমুখ, সেখান থেকেই চিন্তা করলাম দুঃখকে আনন্দে বদলে দিলে কেমন হয়? ওইভাবেই গ্লোবাল হ্যাপিনেজ চ্যালেঞ্জ সিরিজের শুরু হয়।

নবারুণঃ পরবর্তীতে এ সিরিজ নিয়ে আরো কাজ করার ইচ্ছে আছে কিনা?

কার্টুনিস্ট : হ্যাঁ অবশ্যই। এ সিরিজে এখন পর্যন্ত ১১টা ছবি আঁকা হয়েছে। ভবিষ্যতে সিরিজটা নিয়ে ২০১৯-এর মাঝামাঝি একটা সোলো এক্সিবিশন করার পরিকল্পনা আছে। সম্প্রতি আমি গড ফরবিড চ্যালেঞ্জ নামে আরেকটি সিরিজ শুরু করেছি।

নবারুণ : গ্লোবাল হ্যাপিনেজ চ্যালেঞ্জ কার্টুন সিরিজটি দেশের সীমা ছাড়িয়ে পৌঁছে গেছে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এ ব্যাপারে আপনার অনুভূতি কেমন?

কার্টুনিস্ট : অবশ্যই অনুভূতি খুবই ভালো। কারণ এ সিরিজের দ্বারা আমার দেশের নাম যেমন পরিচিত হয়েছে পাশাপাশি বাংলাদেশের আর্টিস্ট হিসেবে ব্যাপকভাবে গ্লোবাল মিডিয়া ফিচার করছে। কাজের দ্বারা বাংলাদেশের নাম বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারছি এটা অবশ্যই আনন্দের এবং অনুভূতিটা গৌরবের।

নবারুণ : আপনার কী মনে হয় এ সিরিজটি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে কতটা পালটাতে পারে বিশেষ করে শিশুদের?

কার্টুনিস্ট : মূলত ছবিগুলো শিশুদের জন্য তো আঁকিনি। আমি তো চাই যে শিশুদের চোখে যাতে এ হতাহতপূর্ণ ছবিগুলো না পড়ে। আর দৃষ্টিভঙ্গি কার কতটুকু পালটাতে পারে সেটা আমি চিন্তা করিনি। এতটুকু মাথায় ছিল এ কাজের দ্বারা যদি একজন মানুষেরও চিন্তাধারার পরিবর্তন হয় তবে কাজটি সফলতা পাবে। তবে এ কাজের জন্য আমি কেবল আমার দেশের নয়

বিশ্বের ২৪টি দেশের সাধুবাদ পেয়েছি। আমি বিশ্বাস করি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন একদিনে সম্ভব নয় ধীরে ধীরে পরিবর্তন হবে।

নবারুণ : আঁকাআঁকির জগতে কীভাবে আসা হলো সেই গল্পটি আমরা শুনতে চাই!

কার্টুনিস্ট : আঁকাআঁকি তো ছোটোবেলা থেকেই করতাম। ছোটোবেলায় আমি আর মেজো ভাই একসঙ্গে কমিকস পড়তাম তারপর সেগুলো আঁকার চেষ্টা করতাম। দেখা যেত আমি ভালো না পারার জন্য মন খারাপ করেছি ভাইয়া আমাকে সাহায্য করেছে। ভাইয়ার কাছেই আমার হাতেখড়ি। তারপর ২০১২ সালে উন্মাদ ম্যাগাজিন দ্বারা আমার প্রফেশনাল ক্যারিয়ার শুরু হয়।

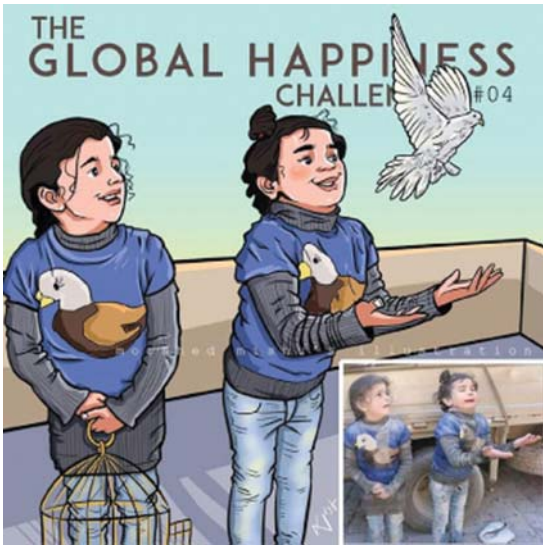

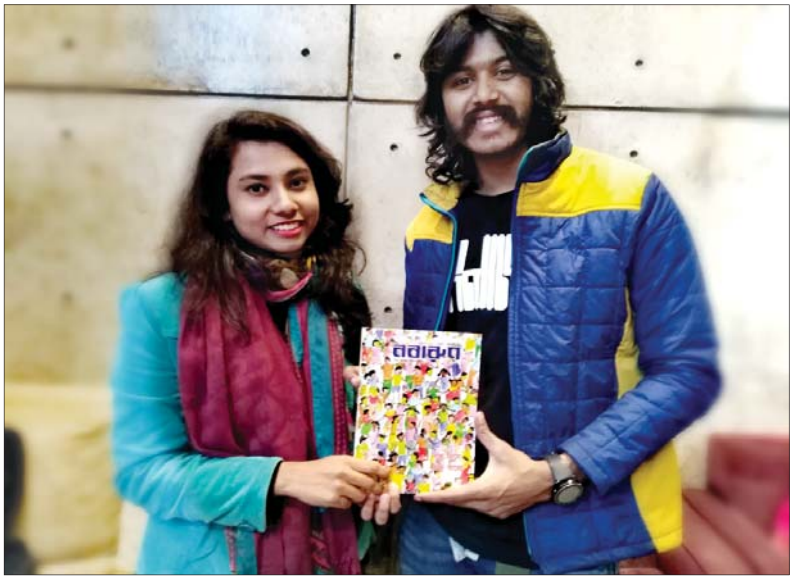

বিখ্যাত আন্তর্জাতিক পত্রিকা 'ফোবর্স' এশিয়ার সেরা তরুণ উদ্যোক্তা ও উদীয়মান তারকাদের একটি তালিকা প্রকাশ করেছে। 'থার্টি আন্ডার থার্টি' নামের এই তালিকায় আছে কার্টুনিস্ট মোরশেদ মিশুর নাম। নবারুণ পরিবারের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন।

নবারুণ : কার্টুন নিয়ে শিশু-কিশোরদের আগ্রহের শেষ নেই কিন্তু কার্টুন আঁকার ক্ষেত্রে তারা কীভাবে শুরু করতে পারে?

কার্টুনিস্ট : বাচ্চারা যেভাবে আঁকে কার্টুনের সূত্রপাত বা ধারণাটা কিন্তু তৈরি হয়েছে ওইভাবেই। আমার কাছে মনে হয় বাচ্চাদের যে নিজস্ব জগৎ সেটাকে চাপ না দিয়ে বিকশিত হতে দেওয়া উচিত। সেটা যে-কোনো আর্টিস্ট তৈরি হবার ক্ষেত্রে। হোক সেটা আঁকাআঁকি, গান, নাচ কিংবা অভিনয় সবক্ষেত্রেই।

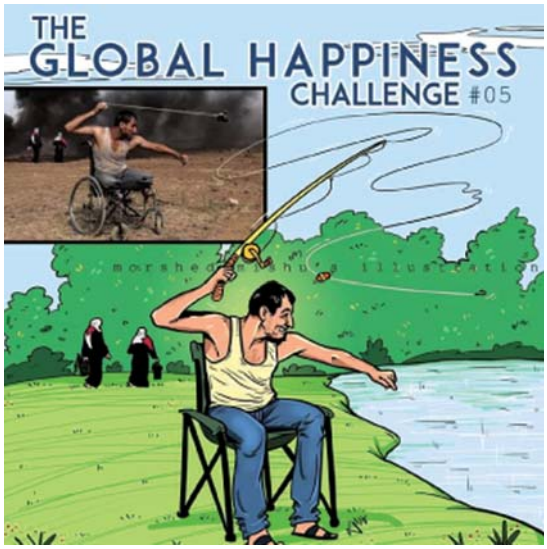

নবারুণ : যুদ্ধ সহিংসতা বন্ধের জন্য অনেক লেখক কলম ধরেছেন। যুদ্ধ বন্ধের জন্য কার্টুন কেমন মাধ্যম হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

কার্টুনিস্ট : শিল্পের মাধ্যমে তো যুদ্ধ বন্ধ করা কঠিন বিষয়। কোনো কিছু আদায়ের উদ্দেশ্যে যুদ্ধের শুরু হয়। আমরা যারা শিল্প নিয়ে কাজ করি তারা নিজের কাজটাকেই প্রতিবাদের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিই। কলম যারা ধরেছেন তারা প্রতিবাদ করবার জন্যই ধরেছেন। তাই যুদ্ধ বন্ধ করার চেষ্টা করতে হবে নিজ জায়গা থেকে প্রতিবাদের মাধ্যমে।

নবারুণ : কার্টুনিস্ট মোরশেদ মিশুকে যদি একটি জাদুর পেন্সিল দেওয়া হয় তাহলে সে কোন্ তিনটি ইচ্ছে পূরণের কথা লিখবে?

কার্টুনিস্ট : আমি মনে করি আমার কাছে ইতিমধ্যেই সেই জাদুর পেন্সিল আছে। আমি যে আঁকতে পারি এটাই একটা জাদু। প্রত্যেকটা মানুষের কাছেই এমন কোনো না কোনো জাদুর উৎস রয়েছে। শুধু সেটা খুঁজে বের করতে হবে। সেটাকে সঠিক কাজে লাগাতে পারলে তিনটি কেন অধিক ইচ্ছে পূরণ করা সম্ভব।

নবারুণ : নিজের পছন্দের কাজকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য কোন বিষয়গুলো মাথায় রাখা উচিত?

কার্টুনিস্ট : সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে নিজে যে কাজটি

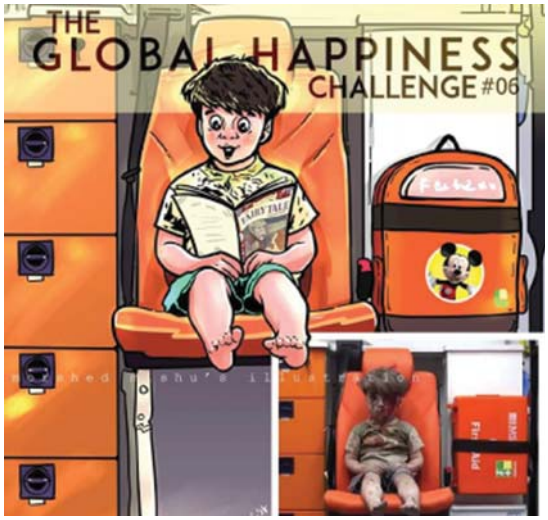

করার জন্য চিন্তা করেছেন সে কাজকে চালিয়ে যাওয়া। কোনোভাবেই হাল না ছাড়া। যে-কোনো কাজে আমরা হয়ত একবার দুইবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দেই কিন্তু সেটা করা একেবারেই উচিত না। তাই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য হাল না ছেড়ে নিয়মিত কাজের চর্চা করে যেতে হবে।

নবারুণ : নবারুণের শিশুদেরকে এই জাদুকরী কার্টুনিস্ট কী বলতে চায়?

কার্টুনিস্ট : প্রকৃতপক্ষে উপদেশ দেওয়া আমার পছন্দ না। তাই নবারুণের শিশুদের আমার বলার মতো তেমন কিছু নেই। কারণ শিশুদের চিন্তার জগৎটাই আলাদা। আমি বলব তোমরা নিজের জগৎটাকে নিজের মতো করে বিকশিত করো। আমি বরং অভিভাবকদের কিছু বলতে চাই। আপনারা বাচ্চাদের খেয়াল রাখবেন অবশ্যই কিন্তু খেয়াল রাখতে গিয়ে অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ করবেন না। তাদের কল্পনার জগতে খেলতে দিন। তারা যদি মনের ইচ্ছেগুলো পূরণ করতে পারে তাহলে ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারবে। আর একজন ভালো মানুষই কিন্তু নিজের দেশকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারে।

নবারুণ: আপনাকে ধন্যবাদ

কার্টুনিস্ট: নবারুণকেও ধন্যবাদ। বন্ধুরা সবাই ভালো থেকো। ■

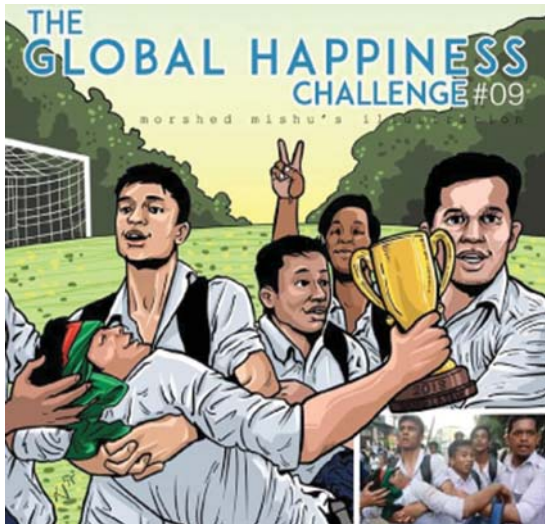

নিবন্ধ

ভাষা-দাদুর সঙ্গে

তারিক মনজুর

নেহাদের বাড়ির সামনে একটুখানি জায়গা আছে। নেহা সেখানে গর্ত করে কয়েকটা পেঁপের বীজ পুঁতে দিলো। এরপর ঘরে এসে রং-পেনসিল নিয়ে বসল। নেহা ঠিক করেছে আজ একটা পেঁপে গাছের ছবি আঁকবে। সেই গাছে একটা বড়ো পাকা পেঁপে ঝুলবে।

আঁকা শেষ করে নেহা নিচে লিখল : 'পেঁপে গাছ'। প্রথমে সে দুইটা চন্দ্রবিন্দু দিলো। পরে মনে হলো একটা চন্দ্রবিন্দু হবে। খানিক পরে মনে হলো – নাহ্, কোনো চন্দ্রবিন্দুই হবে না। পেঁপে বানানে চন্দ্রবিন্দু নিয়ে ভালো সমস্যায় পড়া গেল! আসলে চন্দ্রবিন্দু কয়টা হবে? নাকি হবে না? নেহা ভাবল, কাল পাশের বাড়ির ভাষা-দাদুকে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে হবে।

পরদিন বিকালে নেহা গেল ভাষা-দাদুর বাড়িতে। ভাষা-দাদুর আসল নাম নেহা জানে না। আসলে, তাঁর নাম নিয়ে নেহা কখনো ভাবেনি। শুধু নেহা কেন, অনেকেই তাঁর আসল নাম জানে না। তিনি ভাষা নিয়ে অনেক কিছু জানেন। তাই নেহার বন্ধুরা তাঁকে ভাষা-দাদু বলে ডাকে।

'আচ্ছা, দাদু, পেঁপে বানানে কয়টা চন্দ্রবিন্দু হবে? নাকি হবে না?' নেহা জানতে চায়।

ভাষা-দাদু হাসতে হাসতে বলেন, 'পেঁপে যদি কাঁচা হয়, তবে দুইটা চন্দ্রবিন্দু হবে। আর পাকা হলে একটা চন্দ্রবিন্দু হবে। পচা পেঁপে হলে চন্দ্রবিন্দুর দরকার নেই!'

'তাই!' নেহা অবাক হয়।

ভাষা-দাদু হাসতে হাসতে বলেন, 'আসলে আমি একটু মজা করলাম।'

'তাহলে?'

'তাহলে বোঝার জন্য তোমাকে কাগজ-কলম নিয়ে বসতে হবে।'

নেহা ওর হাতের ছবিটা দেখাল। বলল, 'এই কাগজে আমি পেঁপে গাছের ছবি এঁকেছি। এর উলটো পাশে আপনি বোঝাতে পারবেন।'

ভাষা-দাদুর পকেটে সবসময়ই কলম থাকে। তিনি পকেট থেকে কলম বের করে লিখতে শুরু করলেন :

ক খ গ ঘ... এরপর হয় ঙ
চ ছ জ ঝ... এরপর হয় ঞ
ট ঠ ড ঢ... এরপর হয় ণ
ত থ দ ধ... এরপর হয় ন
প ফ ব ভ... এরপর হয় ম।

নেহা বলল, 'দাদু, এ তো আমি জানি!'

ভাষা-দাদু বললেন, 'এই ডানের ৫টা বর্ণকে মনে রেখ। ঙ, ঞ, ণ, ন, ম। এগুলো মূলশব্দে থাকলে চন্দ্রবিন্দু তৈরি হয়।'

'ভাষা-দাদু আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

ভাষা-দাদু এবার কাগজে লিখলেন :

অঙ্কন
পঞ্চ
কণ্টক
দন্ত
কম্পন।

তারপর নেহাকে বললেন, 'অঙ্কন মানে আঁকা। পঞ্চ মানে পাঁচ। কণ্টক মানে কাঁটা। দন্ত মানে দাঁত। আর কম্পন মানে কাঁপা।'

‘কিন্তু দাদু, আমি তো শব্দের অর্থ জানতে আসিনি। আমি এসেছি চন্দ্রবিন্দু নিয়ে জানতে।’

ভাষা- দাদু এবার ওই পাঁচটা শব্দের পাশে লিখলেন :

অঙ্কন থেকে আঁকা
পঞ্চ থেকে পাঁচ
কণ্টক থেকে কাঁটা
দন্ত থেকে দাঁত
কম্পন থেকে কাঁপা।

তারপর নেহার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘দেখো, এখানে ডানে লেখা সব কয়টা শব্দেই চন্দ্রবিন্দু বসেছে। এই চন্দ্রবিন্দু বসার পিছনে কারণ হলো ওই ৫টি বর্ণ।’

‘৫টি বর্ণ মানে ঙ, ঞ, ণ, ন, ম?’

‘ঠিক তাই! ...অঙ্কন বানানে ঙ আছে। পঞ্চ বানানে ঞ আছে। কণ্টক বানানে ণ আছে। দন্ত বানানে ন আছে। আর কম্পন বানানে ম আছে। এই ঙ, ঞ, ণ, ন আর ম-এর কারণে চন্দ্রবিন্দু তৈরি হয়েছে।’

‘শুধু এই ৫টি বর্ণ?’ নেহা প্রশ্ন করে।

‘এমনকি মূল শব্দে অনুস্বার থাকলেও চন্দ্রবিন্দু তৈরি হয়। যেমন, হংস থেকে হাঁস।’

‘কিন্তু,দাদু, আমার পেঁপের জন্য কী হবে?’

‘পেঁপে বানানে আমরা একটা চন্দ্রবিন্দু দিই। তবে এর কোনো কারণ নেই। এরকম কারণ ছাড়া অনেক চন্দ্রবিন্দুও বাংলা ভাষায় আছে।’ ■

যদি হতো

নূরে আলম ভূঁইয়া

বৃষ্টি যদি মিষ্টি হয়ে পড়ত ধরার বুকে
পেটটি ভরে খেত সবাই থাকত কতই সুখে।
শিশির যদি মুক্তো হয়ে বসত ঘাসের শিষে
সবাই তাতে গয়না গড়ে থাকত শান্তি নীড়ে।
ঘুড়ি যদি বিমান হয়ে উড়ত আকাশ জুড়ে
এক নিমিষে আসত সবাই সারা বিশ্ব ঘুরে।
ডিমগুলো সব স্বর্ণ হলে গড়ত সবাই হার
থাকত না আর অভাব কোনো করত না কেউ ধার।
কাগজগুলো টাকা হয়ে থাকত যদি কাছে
রান্নাঘর আর পাতিলগুলো ভরত মাংস মাছে।
ঘরগুলো সব গাড়ি হয়ে যদি শুধুই চলে
দেশ ভ্রমণে যেত সবাই সত্যি এমন হলে।
সবাই যদি ভালো হয়ে থাকত ফুলের মতো
উঠে যেত হিংসা ঘৃণা পাপের জিনিস যত।

বইয়ের খবর

বইয়ের রাজ্যে হইচই

শামসুল হক আল আমজি

শিশুদের জন্য মজার মজার বই প্রকাশ করে রুম টু রিড। আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা রুম টু রিড নেপাল থেকে এর কাজ শুরু করে। শিশুদের বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে রুম টু রিড শিশুদের চাহিদার উপর নজর দিয়ে বই প্রকাশ করে। যে দশটি বইয়ের কথা বলছি, তা কক্সবাজারের দুই উপজেলা- উখিয়া আর কুতুবদিয়ার শিশুদের কথা ভেবে প্রকাশের কাজ শুরু হয়। এই শিশুদের অনেকের বাবা সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে ঝড়ে প্রাণ হারিয়েছেন। মেয়েশিশুদের অনেককেই বাল্যবিয়ের শিকার হতে হয়। এরাও যেন পড়তে জানা শিশুদের মতো প্রতি মিনিটে ৪৫টি শব্দ পড়তে পারে, সেজন্য বইগুলো প্রকাশ করা হয়েছে। ওদের ভালোলাগার জগতের মতো এই বইগুলোতে আছে মৎস্যকন্যা, জলপরী, দৈত্য দানো, ভূত। প্রতিটি বইয়ের গল্পই শিশুদেরকে কল্পনার রাজ্যে টেনে নিয়ে যাবে। দশটি বইয়ের খুঁটিনাটি একটু বললেই বুঝতে পারবে, আমি যা বলছি তা কতটা সত্যি।

ড. মো. আবু হেনা মোস্তফা কামাল লিখেছেন 'বাদল ও মৎস্যকন্যা' বইটি। সুকন্যা আইনের জাদুর তুলিতে বাদল আর মৎস্যকন্যা সুন্দরভাবে গল্পটি তুলে এনেছে। মায়ের মতো আদর করল মৎস্যকন্যা, আর বাদল তাকে কেন দেখতে পাবে না?

মানিক বৈরাগী লিখেছেন মায়াভরা এক গল্প 'বন বিহঙ্গের কথা'। হারান মিয়া ও শের বাবুর গল্প। হারান মিয়া হচ্ছে হরিণ। শের বাবু বাঘ। দুজনের দুঃখ একই রকমের। দুঃখ কেটেও গেল এক সাথে। কুতুবুল ইসলাম অভি সেই বনটার সব ছবি তুলে এনেছেন তুলিতে।

তারিক মনজুরের লেখা আর এএসএম তানভীর হাসানের তুলিতে 'ওটা কোথায়?' বইটিও দারুণ। ডিম থেকে বের হওয়া কপু খুঁজছে কাকে? কেন বলছে 'ওটা কোথায়?'

আহমেদ রিয়াজ লিখেছেন 'চাঁদের বুড়ি ও জলপরি'। পৃথিবীতে নামল চাঁদের বুড়ি। দেখা হলো জলপরিদের সাথে। পূর্ণিমা রাতে এরকম দৃশ্য দেখতে পেলে কী দারুণই না হতো, তাই না? দারুণ অলংকরণে সেই ভাবনা জাগিয়ে তুলেছেন জয়দেব রোয়াজা।

পচাতুঙ নামের বনের দানব জাদু দিয়ে গ্রামের এক সাহসী যুবককে তক্ষক বানিয়ে দিলো। সে ডাকে টোট-টেং। গ্রামের মানুষদের কে বাঁচাবে পচাতুঙের হাত থেকে? লিখেছেন নাসরীন মুস্তাফা, অলংকরণ করেছেন জিংমুন লিয়াম বম।

অন্য এক গ্রহ থেকে বেড়াতে আসে টিটিং। মহাকাশযান গেল বিকল হয়ে। সাহসী কাঁকড়া ডিং এল এগিয়ে। ফারজানা তান্নীর লেখা 'ডিং ও টিটিং' বইটির দারুণ সুন্দর অলংকরণ করেছেন লোকনাথ রায় তন্ময়।

'তাতাই ও যক্ষবাবু' বইটি লিখেছেন এবং অলংকরণ করেছেন অরণ্য শর্মা। যক্ষবাবুর কাছ থেকে মূল্যবান থালাবাসন ধার নিয়েছিল তাতাই। এরপর কী ঘটল?

কলি ও ধলি এখনো উড়তে শেখেনি। মা যখন খাবার আনতে যায়, তখন কলি আর ধলিকে কে দেখে রাখে? লিখেছেন নূরুল আলম হেলালী 'কলি আর ধলির গল্প' বইতে। অলংকরণ করেছেন মারুফ মিয়া।

সুলতানা জাকিয়া লিখেছেন 'ভূতের বাড়ি ফেরা'। সাপু ত্রিপুরার অলংকরণে সমুদ্রের এক ছোট্ট ভূত মিছু আটকে গেল ডাঙায়। ওকে বাবা-মায়ের কাছে নিয়ে যেতে আসে টিয়া, ছাগল ও বানর।

মেহেদী হাসান মারুফের প্রথম বই 'আলোর খোঁজে সমুদ্রতারা'। নূরে হাসিনাতুন নেসাও প্রথম অলংকরণ করলেন এই বইটি। জোয়ারের পানিতে আটকে যাওয়া তারা মাছ আকাশের তারাদের মতো আলো ছড়াতে চায়।

দশটি বইয়ের অসাধারণ সম্পাদনার কৃতিত্ব সাইদুস সাকলায়েনের। লেখকদের নিয়ে কর্মশালার মাধ্যমে লেখা গল্পগুলোর অলংকরণে বেছে নেওয়া হয়েছে উপকূলীয় অঞ্চলের চিত্রশিল্পীদের।

ধন্যবাদ রুম টু রিড-কে। ভবিষ্যতে শিশুরা এরকম মজার বই আরো পাবে, সে আশা আমরা করতেই পারি। ■

সিসিমপুরের পনেরো বছর

হালুম, টুকটুকি, ইকরি ও শিকুদের নিয়ে ২০০৫ সালের ১৫ই এপ্রিল পথ চলা শুরু করে শিশুদের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান 'সিসিমপুর'। যাত্রার পর থেকে আনন্দ আর খেলার ছলে ৩ থেকে ৮ বছর বয়সি শিশুদের সামগ্রিক বিকাশে ভূমিকা রেখে চলেছে সিসিমপুর। এবছর ১৪ পেরিয়ে ১৫ বছরে পা রাখল। অনুষ্ঠানের চরিত্রগুলো খুদে দর্শকের মন জয় করার মধ্য দিয়ে এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করেছে।

সিসিমপুরের মূলমন্ত্র হলো- পৃথিবীটা দেখছি, প্রতিদিন শিখছি। একদিন সূর্যের সমান প্রাচীন হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে চলেছে সিসিমপুর। বাংলাদেশের প্রতিটি শিশুর প্রাক-শৈশবকে পূর্ণাঙ্গ ও বিকশিত করবে 'সিসিমপুর'। ছোটোদের পাশাপাশি বড়োদের কাছেও জনপ্রিয় এই অনুষ্ঠানটি। সারাদেশের প্রায় এক কোটি দর্শক অনুষ্ঠানটি উপভোগ করছে। এখন চলছে সিসিমপুরের একাদশ সিজন। বিটিভি ছাড়াও অনেক বেসরকারি টিভি চ্যানেলেও সিসিমপুর প্রচারিত হয়।

নিবন্ধ

মো. সিরাজুল ইসলাম

আমার বন্ধু ভীষণ বিজ্ঞান প্রেমি। তার কেজি পড়ুয়া ছেলেকে ঘুমপাড়ায় বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কারের গল্প শুনিয়ে। একবার শোনালো শূন্য আবিষ্কারের গল্প। শূন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ , তাৎপর্যপূর্ণ। শূন্যতে সংখ্যামান বেড়ে যায়। শূন্য গণিতে দিয়েছে নতুন পথের সন্ধান। এটা এক গর্বের আবিষ্কার। আরো গর্বের হলো এ আবিষ্কার প্রাচীন ভারতবর্ষের, যার ভেতর আজকের বাংলাদেশও ছিল। তো কিছুদিন পর ছেলে স্কুল থেকে ফিরে বাবাকে বলছে–

: বাবা জানো ,আজ আমি সেই গর্বের জিনিস পেয়েছি।

: হ্যাঁ বাবা, বলো বলো, তুমি কী পেয়েছ ?

: বাবা আমি অঙ্কে শূন্য পেয়েছি !

কিছুদিন আগে বড়ো ভাইয়ের বাসায় ঢাকার অভিজাত এলাকায় বেড়াতে গেছি। ভাতিজা ইংরেজি মাধ্যমে লেখাপড়া করে। এটি বেশ গর্বের বিষয় ভাবির কাছে। আমার দায়িত্ব পড়ল একদিন ওকে স্কুল থেকে নিয়ে আসার। স্কুলে গিয়ে, কৌতূহল বশে লেখাপড়ার ধরনধারণ দেখতে এগিয়ে গেলাম। ইংরেজি স্কুলের শিক্ষক ছাত্রদের কাছে ইংরেজিতে প্রশ্ন করলেন-

:Who has invented steam engine (স্টিম ইঞ্জিন কে আবিষ্কার করেন) ?

ছাত্র ভালোমতো শুনতে না পেয়ে টিচারকে উলটো প্রশ্ন করছে-

: হোয়াট স্যার?

শিক্ষক : ঠিকই বলেছ, তবে পুরো নাম হলো জেম্‌সওয়াট।

ইংরেজি মাধ্যমে লেখাপড়ার হালচাল তো দেখা হলো। এবার মুখিয়ে থাকি আর সব স্কুলের বিজ্ঞান পড়া কেমন, তা জানতে।

বাংলা মাধ্যমে বেশ নামকরা এক স্কুলে চাকরি করেন আমার এক সময়ের ক্লাসমেট বন্ধু। অনেকদিন দেখা হয় না, ঢাকায়ও সব সময় আসা হয় না, তো বন্ধুর সাথে দেখা করতে গেলাম। সৌজন্য আলাপ পরিচয়ের পর ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক আমার বন্ধুর শ্রেণিকক্ষে গিয়ে দেখা করতে বললেন। বিজ্ঞান ক্লাসে আমার বন্ধু হোমওয়ার্ক নিয়ে কথা বলছিলেন।

আমার বন্ধু (শিক্ষক) : তোকে ব্যাকটেরিয়ার চিত্র আঁকতে বলেছিলাম। তুই তো দিলি সাদা কাগজ। তা ব্যাপাটা কী ?

ছাত্র : স্যার, আমি তো কাগজে ব্যাকটেরিয়ার চিত্রই এঁকেছি। আপনি তো ব্যাকটেরিয়া খালি চোখে দেখতে পারবেন না।

আমার বন্ধুর চোখ চড়কগাছে ! ব্যাকটেরিয়ার পাঠ রেখে এবার তিনি বিবর্তনবাদের দিকে মনোনিবেশ করলেন।

শিক্ষক: বানর থেকে মানুষ হতে লেগেছে বিশ লাখ বছর...

ঠোঁটকাটা এক ছাত্র বলে উঠল : স্যার, এটা কীভাবে সম্ভব, এতদিন কোনো প্রাণী বাঁচে নাকি ?

আমার বন্ধু, বিজ্ঞান শিক্ষক এবার নিজেকে সামলে নেওয়ার জন্য আবিষ্কারের গল্প জুড়ে দিলেন। যাতে ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়। নিউটন আপেল গাছের নিচে বসেছিলেন। উপর থেকে আপেল পড়ল মাটিতে। আপেল পড়া দেখে নিউটনের মাথায় এল মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কথা। অতঃপর পাঠ পর্যালোচনায় গিয়ে প্রশ্ন করছেন,

শিক্ষক : নিউটনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব থেকে আমরা কী শিখলাম?

ছাত্র : স্যার, ক্লাসে বসে না থেকে গাছতলায় বসে থাকা উচিত!

অগত্যা আমার বন্ধু সেদিনের পড়া মুলতবি রেখে আমার দিকে মনোযোগী হয়ে উঠলেন।

এখন সব পড়া তো আইটি দিয়ে। কাজেই আইটি শেখা কেমন চলছে সেটাও ঘুরে দেখতে গেলাম। আইটি ক্লাসে টিচার জিজ্ঞেস করছেন- তোমরা বইপত্র পড় তো?

শিক্ষার্থী : হ্যাঁ পড়ি, তবে কোনটার কথা জানতে চাইছেন স্যার ?

টেক্সট বুক না ফেসবুক ?

বস্তুত ফেসবুক আমাদের নিয়ে যাচ্ছে বহুদূর। ফেসবুকে পড়াশোনা, ফেসবুকে সাজেশন, উদ্দীপক, সৃজনশীল সব আয়োজন।

এবার ফেসবুকের গল্প বলি। অভিমান করে রেলগাড়ির নিচে মাথা দেবে বলে একজন রেললাইনে হাজির হলো। হঠাৎ মনে হলো বন্ধুদের জন্য স্ট্যাটাস দেওয়া হয়নি। স্ট্যাটাস দিয়ে আসি। স্ট্যাটাস দিতে বাড়ি ফিরে এল। ততক্ষণে ট্রেন চলে গেছে। বোধোদয় হলো, ফেসবুক জীবন বাঁচায়।

শেষ করব বিদেশি কাহিনি দিয়ে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীর কথা দিয়ে। এবারনেথি ছিলেন ইংরেজ চিকিৎসক (১৭৬৪-১৮৩১)। শিক্ষক এবং চিকিৎসক হিসেবে তার বিশেষ খ্যাতি ছিল। একবার অবসাদগ্রস্ত এক রোগী, এবারনেথির কাছে এসে দেখা করলে, তিনি তাকে পরীক্ষানিরীক্ষা করে বললেন, আপনার আনন্দ-ফুর্তি দরকার। প্রশান্তি দরকার। আপনি এক কাজ করুন। বিখ্যাত কৌতুক অভিনেতা *গ্রিমাল্ডির কৌতুক* উপভোগ করুন। তিনি আপনার প্রসন্নতা ফিরিয়ে দিতে পারবেন। ওষুধপত্রের চেয়ে ঐটাই হবে আপনার জন্য উত্তম। ডাক্তারের পরামর্শ শেষ হওয়ার পর রোগী বললেন, 'আমি নিজেই গ্রিমাল্ডি!' ■

রুবাবা সামাদ, সপ্তম শ্রেণি, স্কলারস স্কুল অ্যান্ড কলেজ ধানমন্ডি, ঢাকা

বাংলার রূপ আমি দেখিয়াছি

ছবি- মোহাম্মদ সাজেদ

গুগোল অনুসন্ধান কীভাবে কাজ করে?

সালমান শাহ্ আকবর শুভ

গুগোল আমাদের মনে এমনভাবে গেঁথে গেছে যে, এখনো অনেকেই আমরা মনে করি ইন্টারনেট মানেই গুগোল।

সেটা মনে করবেই বা না কেন? আমরা সবাই জানি গুগোল এমন একটি ওয়েবসাইট যেখানে আমরা যা-ই লিখি না কেন গুগোল সেটারই তথ্য আমাদের দিয়ে সাহায্য করে। আমরা কি কখনো ভেবেছি গুগোল আসলে কীভাবে কাজ করে?

এই লেখায় তোমাদের জানাব এই গুগোল ওয়েবসাইট কীভাবে কাজ করে। এমন একটা সময় ছিল যখন আমাদের দেশে ইন্টারনেট ঠিকভাবে কাজ করত না। আমরা কোনো একটি ওয়েবসাইটে ঢুকতে হলে সাইবার ক্যাফে বসতাম এমনও হতো যে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করতে হতো।

কিন্তু আজ আমাদের সেই দিনটি নেই। ইন্টারনেট এখন সবার হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। আমরা কোনো কিছুর সম্পর্কে জানতে চাইলে গুগোলে সার্চ করলেই চলে আসে। আবার গুগোলকে আমরা মুখ দিয়ে কিছু বললেও সে আমাদের সেই সম্পর্কে সঠিক তথ্য মুহূর্তেই দিয়ে দিতে পারে। কিন্তু আসলে গুগোল সার্চ কীভাবে কাজ করে?

গুগোলে ২-৪ টা শব্দ দিলেই আমরা জেনে যাই সেই সম্পর্কে সঠিক তথ্য। তাহলে আপাতত আমরা একটি প্রশ্ন ধরে নেই যে আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী সম্পর্কে জানতে চাই গুগোল-এর কাছে। তাহলে আমরা গুগোলে লিখব 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী' তাহলে গুগোল আমাদের তথ্য দিয়ে সাহায্য করবে।

আবার আমরা যদি একই প্রশ্ন একটু অন্যভাবে লিখি 'বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী' গুগোল আমাদের তবুও সঠিক উত্তর দিয়ে সাহায্য করবে। মানে তুমি একটি প্রশ্ন যত ভাবেই ঘুরিয়ে লিখ না কেন এসো জেনে নেই গুগোল কীভাবে জানবে যে তাকে কী উত্তর দিতে হবে।

গুগোল আমাদের বিভিন্ন ওয়েবসাইটের লিঙ্ক দিয়ে সাহায্য করছে আমরা যা-ই লিখি না কেন। আবার এই লিঙ্কগুলো কিছু প্রথম পেজে দেখায় কিছু দ্বিতীয় পেজে দেখায়, এভাবে অনেকগুলো পেজে দেখায়। তোমাদের বলে রাখি এটা কখনো ভাববে না যে গুগোল পুরো ইন্টারনেট সার্চ করে। আবার এটাও ভেবো না যে গুগোলই আসলে সম্পূর্ণ ইন্টারনেট।

ইন্টারনেট আসলে অনেক বড়ো জিনিস এটার সাথে কখনোই গুগোল-এর তুলনা করবে না। গুগোল আসলে বিশাল ওয়েব প্রোগ্রাম যার দ্বারা গুগোলের বাহিরে যতগুলো ওয়েবসাইট আছে সবগুলোর ইনডেক্স গুগোল নিয়ে রাখে। গুগোল-এর এই প্রোগ্রামকে আরো বলা হয় ক্রাওলার বা স্পাইডার। এই ওয়েব প্রোগ্রামগুলো এমন ভাবে তৈরি যা গুগোল-এর বাহিরে যত ওয়েবসাইট আছে সব ওয়েবসাইটকে সম্পূর্ণভাবে স্ক্যান করে।

পড়শী চক্রবর্ত্তী পর্ণা, তৃতীয় শ্রেণি, শিবপাশা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নবীগঞ্জ হবিগঞ্জ

যখন আমরা কোনো একটা বিষয় নিয়ে ওয়েবসাইটে সার্চ করি তখন গুগোল-এর ওয়েব প্রোগ্রামগুলো সবগুলো ওয়েবসাইটে সার্চ করা শুরু করে এবং খুঁজতে থাকে কোন কোন ওয়েবসাইট-এর লিঙ্কে ঐ বিষয়ের উপর তথ্য আছে। এভাবে এক লিঙ্ক থেকে অন্য লিঙ্কে যেতে যেতে গুগোল-এর বিশাল তথ্য ভাণ্ডার আমাদের সামনে হাজির করে এবং এই লিঙ্কগুলোই গুগোল তার সার্চ পেজে দেখায়।

যদি আমরা সার্চ করি 'বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী' তখন গুগোল বিভিন্ন ওয়েবসাইট-এর লিঙ্কগুলোতে এই দুটি শব্দ খুঁজতে থাকবে। এভাবে খুঁজতে থাকবে যে-কোনো ওয়েবসাইট-এর লিঙ্কে এই দুটি শব্দ বেশি ব্যবহার হয়েছে, টাইটেলে কতবার বেশি ব্যবহার হয়েছে, ঐ টাইটেল-এর আর্টিকেলে কতবার ব্যবহৃত হয়েছে, কোন আর্টিকেলটা সবচেয়ে বেশিবার পড়া হয়েছে। এভাবে গুগোল অনেক কিছুই সার্চ করে। আবার দেখে যেই পেজে ঐ দুটি শব্দ রয়েছে সেই পেজের সাথে আবার কতগুলো অন্য ওয়েবসাইট-এর লিঙ্ক আছে।

আবার কোন ওয়েবসাইট কত জনপ্রিয়। কোন ওয়েবসাইট-এর মূল্য কেমন। এভাবে গুগোল অনেক কিছুই বিশ্লেষণ করে তোমাদের রেজাল্ট দেখায় অনেকগুলো পেজে। যদিও তোমরা প্রথম পেজেই সঠিক তথ্য পেয়ে যাও।

কয়েক বছর আগেও গুগোল আমাদের এত নির্ভুল তথ্য দিত না। কিন্তু এখন যুগের সাথে তাল মিলিয়ে গুগোল দিনের পর দিন আরো সমৃদ্ধ হচ্ছে। এখন ব্যাপারটা এমন হয়ে গেছে যে তুমি গুগোলে কী কী সার্চ করো কী কী দেখো গুগোল সেই তথ্যগুলোও নিয়ে রাখে।

ধরো তুমি গুগোলে সার্চ দিলে আইফোন ১০-এর দাম কত? এরপর থেকে দেখবে গুগোল তোমার সামনে আইফোন-এর তথ্যগুলোই নিয়ে আসছে বার বার। মানে গুগোল তোমার বিভিন্ন ওয়েবসাইট- এর চাহিদাগুলোও সংরক্ষণ করে রাখে যাতে তুমি ভবিষ্যতে কোনো কিছু লিখে সার্চ দিলে গুগোল তোমার চাহিদা অনুযায়ী ফলাফল তোমাকে দিতে পারে। আজ তুমি যদি সার্চ করো ফ্লাইট-এর টিকিট, একটু পরেই দেখতে পাবে বিশ্বের সব বড়ো বড়ো ট্রাভেল কোম্পানির ফ্লাইট-এর টিকিটের অ্যাডভারটাইজমেন্ট চলে আসবে।

গুগোল-এর প্রোগ্রামিং-এ যেই স্পাইডার বা ক্রাওলার আছে তা বিভিন্ন ওয়েবসাইট-এ ঘুরতেই থাকে আর তোমাদের চাহিদা মতো তথ্য দিয়ে সাহায্য করে।

কিন্তু গুগোল যে তোমাদের এত সব ডাটা নিয়ে নিচ্ছে তোমার চাহিদা বুঝার জন্য এসবের প্রাইভেসি কী?

গুগোল যে তোমার ডাটা নিয়ে অন্য কোথাও বিক্রি করছে না সেই সম্পর্কেই বা আমরা কতটুকু নিশ্চিত। কিছুদিন আগেও ফেসবুক-এর মতো কোম্পানির বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ ব্যবহারকারীর ডাটা বিক্রি করার অভিযোগ পাওয়া গিয়েছিল।

যাই হোক ইন্টারনেট ডেটা সিকিউরিটি নিয়ে অন্য কোনো আর্টিকেলে বিশদভাবে জানার চেষ্টা করব। আজ এ পর্যন্তই। ■

মশা, ব্যাঙ, বক এবং তুতুল

দ্রানুপা আনজানা

তুতুলের পরশু বাংলা পরীক্ষা। পড়ার টেবিলে বসে সে শব্দার্থ পড়ছিল। ঘড়িতে তখন রাত ৮টা। পড়া প্রায় শেষ। হঠাৎ একটা মশা তুতুলকে খুব জ্বালাতে লাগল। কানের কাছে এসে শুধু পোঁ পোঁ করছে। পোঁ পোঁ করতে করতে হাতে বসল মশাটা। তুতুল ভাবল, ভালোই হয়েছে; এখন মশাটাকে মারতে পারব। তুতুল ঠাস করে মশাটা মারল। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, মশাটা হাতে মরাও ছিল না, মেঝেতে পড়াও ছিল না; এমনকি উড়েও যায়নি। তাহলে কী হলো?

মশার কথা ভাবতে ভাবতে তুতুল ঘুমিয়ে গিয়েছিল। পরদিন সকালে মা ডাকল, 'তুতুল, ঘুম থেকে ওঠো।' ঘুম থেকে উঠে তুতুল বলল, 'মা, স্কুলে যাব না?' মা বলল, 'আরে, কী আজব কথা! তোমার স্কুল তো আজ বন্ধ। কালকে পরীক্ষা না? তাড়াতাড়ি উঠে পড়তে বসো। আমি খাবার দিচ্ছি।'

তুতুল হাত-মুখ ধুয়ে পড়তে বসল। সেই একাই পড়ার টেবিলে। পড়তে পড়তে এক ঘণ্টা হয়ে গেল। তুতুলের খাওয়াও শেষ। তুতুল এখন পড়া শেষ করে বইখাতা গুছাচ্ছে। হঠাৎ বাংলা বইয়ের নিচ থেকে বেরিয়ে এল একটি ব্যাঙ। ব্যাঙটি তুতুলের দিকে তাকিয়ে বলল –

আমি কোলা ব্যাঙ
ডাকি ঘ্যাঙর-ঘ্যাং।
বলো দেখি আঙুর ফল
মিষ্টি নাকি টক?
তুতুল তোমায় বলছি কারণ
খাবে কালো বক।

ব্যাঙের গলায় মানুষের আওয়াজ শুনে তুতুল ভয় পেল। আরো ভয় পেল তার নাম বলার কারণে। তুতুল তাড়াতাড়ি সব বইখাতা গুছিয়ে রেখে এসে দেখে, ব্যাঙটি টেবিলে নেই! সে পুরো বাসা খুঁজল। কিন্তু পেল না।

রাতে ঘুমাতে গেল তুতুল। আজ ঘুমাতে খুব দেরি হয়ে গেল। দেরি তো হবেই; কাল পরীক্ষা। মাঝরাতে বিছানায় দেখল, তার পাশে কালো রঙের একটি বক শুয়ে আছে। সে এতটাই ভয় পেল যে চিৎকার দিলো। পরে লাইট জ্বালিয়ে দেখল, কিচ্ছু নেই। পাশে একটা কোলবালিশ।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে তুতুল পরীক্ষা দিতে গেল। প্রথম প্রশ্নে লেখা ছিল, সাতদিনের নাম লেখ। সে লিখতে শুরু করল। লিখতে লিখতে তুতুলের মনে হলো, সে যেন অন্য কোনো এক দেশে এসে পড়েছে। এদিক-ওদিক ঢোল বাজানোর শব্দ। সামনে গিয়ে দেখল, বড়ো রাজপ্রাসাদ। সেখানে ঢুকল। আর রাজার সামনে গেল। রাজাকে বলল, 'এদেশের নাম কী?'

রাজা বললেন, 'এদেশের নাম সৌরজগৎ।'

তুতুল বলল, 'এটা কেমন দেশ? এদেশের নাম তো শুনিনি!'

রাজা বললেন, 'এদেশে ৮ দিনে ১ সপ্তাহ। আর সেগুলো হচ্ছে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন। ...কিন্তু তুমি এখানে কীভাবে এলে?'

তুতুল : জানি না।

রাজা : তুমি বুঝি পৃথিবীতে থাকো?

তুতুল : হ্যাঁ। কিন্তু আপনি কীভাবে জানলেন?

রাজা : আমাকে মন্ত্রী মশা, সেনাপতি ব্যাঙ আর রাঁধুনি বক বলেছে।

রাজার মুখে এরকম কথা শুনে তুতুল অবাক হলো। রাজা বললেন, 'ওদেরকে আমি পাঠিয়েছিলাম পৃথিবী থেকে কাউকে এখানে নিয়ে আসতে।'

তুতুল : কিন্তু আমি এখানে কীভাবে পৌঁছলাম? আমার তো পৃথিবীতে পরীক্ষা চলছে।

রাজা : কোনো চিন্তা নেই। পরীক্ষার হলে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসব।

একটু পর তুতুল দেখে, সে পরীক্ষার হলে বসে আছে। ■

তাহমিদ আজমাঈন আহনাফ, তৃতীয় শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল ইংলিশ ভার্সন স্কুল, বনশ্রী শাখা, ঢাকা

কিল

হাফিজ উদ্দীন আহমদ

কুচকুচে কালো রং। মাথার দুপাশে দুটো শিং। চোখ দুটো তো চোখ নয়, আগুনের গোলা।.রাতে ভূত ঢুকল ঘরে। ভয়ে সিঁটিয়ে থাকল জামিল। কাছে এসে ভূতটা বলল -

: তোমাকে আমি কিলাবো।

কেন? কেন?

কণ্ঠ আড়ষ্ট হয়ে গেছে, তবু অনেক চেষ্টায় উচ্চারণ করল জামিল কথাটা।

: কারণ তুমি সুখে আছো।

: পড়তে পড়তে আর বাবা-মা'র বকা খেতে খেতে আমার কলিজা পুড়ে কাবাব হয়ে গেছে। কে বলল আমি সুখে আছি?

সাহস করে যুক্তি দেখাল সে।

: তুমি পরীক্ষায় জিপিএ ফাইভ পেয়ে পাস করে স্কুলে ঢোল-করতাল বাজিয়ে নাচানাচি করছিলে।

: তাতে আপনার কী?

ভয়ের চিহ্ন মুখ থেকে মুছে ফেলে নিজেকে বাঁচাতে চাইল জামিল, না হলে ভূতের কিল খেয়ে ভর্তা হয়ে যেতে হবে।

: আমার কী মানে? তুমি আমাদের স্বাধীনতা দিবস কবে জানো না, বিজয় দিবস কবে জানো না, দুটোকেই গুলিয়ে ফেলো। আমাদের ভাষা দিবসটা কবে সেটাও ঠিকমতো বলতে পারো না। এসব না জেনেও টিক মার্ক দিয়ে জিপিএ-ফাইভ পেয়ে আনন্দ করছ, লাফাচ্ছো। তুমি খুবই সুখে আছো, এটাই তো তার প্রমাণ। সুখে থাকলে ভূতে কিলায় তা কি তুমি জানো না?

বলেই গুড়ুম করে কিল বসালো ভূত তার পিঠে।

: মা, মা গো!

ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল জামিল।

: কী, কী হয়েছে বাবা?

রান্নাঘরে ডালে বাগার দিচ্ছিলেন মা। উদ্বিগ্ন হয়ে তা বাদ দিয়ে ঘুটনি হাতেই ছুটে এলেন তিনি। দেখলেন জামিল বিছানার নিচে পড়ে আছে।

: কতদিন বলেছি দুপুরবেলা অমন ভোঁস ভোঁস করে ঘুমাবি না। আর ঘুমালেও এত গড়াগড়ি করিস কেন বিছানায়?

■

গল্প

একটি বটগাছের কথা

নাসিম সুলতানা

রসুলপুর গ্রামে টুটুলের দাদার বাড়ি। গ্রামটি টাঙ্গাইলের কালিহাতি থানায় অবস্থিত। তারা এবার গ্রামের বাড়ি যাবে গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে। তাই বাড়ির সবাই খুব আনন্দিত। টুটুল ভাবছে অন্য কথা। সে ১০ দিনের ছুটিতে বাড়ি যাবে। আহ! কী আনন্দ। কতই না মজা করবে ওর চাচাতো ভাইদের সাথে। ওদের গ্রামটি বড়োই সুন্দর। গ্রামের এক পাশ দিয়ে বয়ে গেছে শাখা নদীর অংশ। পাশে একটা বিশাল মাঠ। এই মাঠেই বৈশাখি মেলা, চৈত্রসংক্রান্তি মেলা, নবান্নের মেলা আরো কত কী অনুষ্ঠান হয়। বড়োই মনোরম দৃশ্য চারপাশে। নদীর পাড়েই একটা বিশাল বটগাছ। গাছটি অনেক পুরানো আমলের। দূরদূরান্ত থেকে আসা পথিকেরা দুপুরের আগুনের মতো রোদ থেকে একটু শীতল শান্তি হিমেল বাতাস পাওয়ার জন্য এই গাছতলায় ঘুমিয়ে নেয়। কী সুন্দর বাতাস যেন হৃদয় ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। শুধু তাই নয়, নানা রঙ-বেরঙের পাখিরাও এ গাছে যেন নিভৃতে বাসা বেঁধেছে। সন্ধ্যার সময় তারা তাদের মধুর সুরে গান গাইতে গাইতে ক্লান্ত হয়ে যে যার নীড়ে এই গাছেই আশ্রয় নেয়।

এই বটগাছটি অনেক উপকারে এসেছে এলাকাবাসিরও। টুটুলরা বেড়াতে যায় দাদাবাড়ি। তো টুটুলরা একদিন খেলতে খেলতে অনেক ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। হাফ টাইমে তারা এই বটগাছ তলায় বসে পানি ও নাস্তা খাচ্ছে। হঠাৎ টুটুলের মনে হলো কে যেন কাঁদছে। সে চারদিকে তাকিয়ে দেখল তারা ছাড়া কেউ নেই কোথাও। তাহলে কে কাঁদছে? এ প্রশ্ন তার বন্ধুদেরও। তারাও খেয়াল করল যে সত্যিই তো! কেউ কোথাও নেই। অথচ কান্নার আওয়াজ কেন? তারা আরো খেয়াল করল যে কান্নাটি বটগাছের গোড়া থেকেই ভেসে আসছে। প্রথমে তারা ভয় পেয়ে গেল। আসিফ, সাগর,তপন, মিঠু ওরা তো ভূত মনে করে চলে যেতে চাচ্ছিল। টুটুলই ওদের ধমক দিল। বলল-বাহ্ তোরা না গ্রামে থাকিস ? আর এই ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছিস! আম্মু বলেছে ভূত বলতে কিছু নেই। চল্ আমরা সবাই মিলে খুঁজে দেখি কোথা থেকে কান্নার আওয়াজ আসছে। ওরা সবাই গাছটার কাছে এদিক-ওদিক খুঁজছে। কিন্তু ওরা ছাড়া আর কাউকে তো দেখা যাচ্ছে না। তবে কে কাঁদছে। এবার টুটুল সাহস দেখালেও সেও কিছুটা ভয় পেয়ে গেল। হঠাৎ মনে হলো গাছটার কাছ থেকে কথার আওয়াজ ভেসে আসছে। গাছটি বলছে আমিই কাঁদছি। আমি কাঁদছি এজন্য যে - তোমরা খেয়াল করে দেখ আমার গোড়ার

এক অংশের মাটি ভেঙে নদীতে নিয়ে গেছে। এখন বলো-আমি আর কতদিন টিকব। এক পাশে মাটি না থাকার কারণে গাছটি যে-কোনো সময় উপড়ে পড়ে যাবে। তখন আমি কাউকে ছায়া দিতে পারব না, কাউকে বাতাস দিতে পারব না। কেউ আমার নিচে আশ্রয় নিবে না। পাখিরা তার বাসা খুঁজে পাবে না।

এত সব কষ্টের কথা ভেবে আমি কাঁদছি। এক চিন্তা করি আমি নদী বহে কিনা বয়, অন্য চিন্তা করি আমি পাখি কোথায় গিয়া রয়। তোমরা ভালো ছেলে, ঐ জমি থেকে মাটি এনে আমার যে পাশে মাটি সরে গেছে সেখানে দাও। তারপর ইট দিয়ে গোড়াটা বেঁধে দাও। তাহলে মাটি আর সরবে না, আমিও মরে যাব না। আমি তোমাদের আবার ছাঁয়া দিতে পারব, বাতাস দিতে পারব। বৃষ্টির সময় আশ্রয় দিতে পারব। পাখিদের বাসাগুলোও নিরাপদে থাকবে এবং নদীও সুন্দরভাবে বয়ে যাবে। একথা শুনে তারা সকলে খুব অবাক হয়ে গেল। গাছেরও প্রাণ আছে। গাছও যে মানুষের, প্রকৃতির কত বড়ো বন্ধু তা তারা সকলে বুঝতে পারল।

পরদিন গ্রামের সকলের কাছে তারা কথাগুলো বলল। গ্রামের মাতব্বররাও বলল, ঠিকই তো। এত পুরনো আমলের বটগাছ-এটা আমাদের সকলকে রক্ষা করতে হবে। তারা তখন গ্রামের ছোটো-বড়ো সকলে মিলে গাছটি রক্ষা করার কাজে লেগে গেল। ■

নারীর ক্ষমতায়ন: কন্যাশিশুর সাফল্য

কিশোরী ও প্রতিবন্ধীর কৃতিত্ব

জান্নাতে রোজী

প্রথমবারের মতো ৬৯ বছর বয়সি এক প্রতিবন্ধী ও দুই কিশোরীসহ ৩১ জন সাঁতারু বাংলা চ্যানেল পাড়ি দিয়েছেন। সম্প্রতি ১৪তম এ সাঁতার প্রতিযোগিতায় ৩৪ জন দেশীয় সাঁতারু অংশ নেন। পানিতে ডুবে মৃত্যু থেকে রক্ষা পেতে সচেতনতা সৃষ্টি করতে ষড়জ অ্যাডভেঞ্চার ও এক্সট্রিম বাংলার আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় ফরচুন বাংলা চ্যানেল সাঁতার প্রতিযোগিতা।

১৩ বছর বয়সি সোহাগী আক্তার বাংলা চ্যানেল পাড়ি দিতে সময় নিয়েছে ৫ ঘণ্টা ৩ মিনিট ৩ সেকেন্ড। সে গাইবান্ধা এনএইচ মডার্ন উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী এবং গাইবান্ধা সদরের পূর্ব সবুজপাড়ার বাসিন্দা। বাংলা চ্যানেল পাড়ি দেওয়া আরেক কিশোরী মোছাম্মৎ মিতু আখতার বগুড়া সদরের জামিল নগরের বাসিন্দা। ১৬ বছর বয়সি মিতু আখতার চ্যানেল পাড়ি দিতে সময় নিয়েছেন ৪ ঘণ্টা ৫ মিনিট। সে এর আগে বাংলাদেশ গেমসে সাতটি পদক অর্জন করে।

৬৯ বছর বয়সি মোহাম্মদ শোয়াইব ঢাকার গুলশানের বাসিন্দা। চার বছর বয়সে পোলিও আক্রান্ত হয়ে তার ডান পায়ে সমস্যা সৃষ্টি হয়। তিনি বাংলা চ্যানেল পাড়ি দিয়েছেন ৫ ঘণ্টা ৪০ মিনিট।

কক্সবাজারের টেকনাফের শাহপরীর দ্বীপ থেকে সেন্টমার্টিন পর্যন্ত ১৬.১ কিলোমিটার দূরত্বের বঙ্গোপসাগরের স্রোতোধারাটির নাম 'বাংলা চ্যানেল'। ২০০৬ সালের ১৪ই জানুয়ারি বাংলা চ্যানেলের যাত্রা শুরু হয়।

আইসিসি'র স্বীকৃতি 'ক্যাপ' পেলেন রোমানা

বাংলাদেশের অলরাউন্ডার নারী ক্রিকেটার রুমানা আহমেদ পেলেন আইসিসি'র স্বীকৃতি স্মারক 'ক্যাপ'। সম্প্রতি আইসিসি তাকে এ পদক বুঝিয়ে দিয়েছে। রুমানা ২০১৮ সালের বর্ষসেরা নারী টি-টোয়েন্টি দলে সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন আইসিসি'র কোনো দলে জায়গা পাওয়া প্রথম বাংলাদেশের নারী ক্রিকেটার। ■

গল্প

বন্ধুর জন্য

মো. ফিরোজ খান

খেলার মাঠে আমার জীবনের প্রথম ম্যাচ। মাঠে আমার পাশে একটি ছেলে খুব গম্ভীর হয়ে বসে আছে। আমি দু'য়েকবার তার মুখের দিকে তাকালাম, সেও আড়চোখে আমার দিকে তাকাল। আমি বললাম, তোমার নাম কী? ও বলল, সবুজ আলি। আমি বললাম, আমি ফিরোজ খান। আমরা কি বন্ধু হতে পারি? আমি হাত বাড়িয়ে দিয়ে ওর সঙ্গে হাত মিলালাম।

কয়েকদিন খেলা করার পর ওর সঙ্গে সহজ হয়ে গেলাম। কিন্তু একটা সমস্যা দেখা দিলো। আজ আমার ব্যাট হারায় তো কাল বল হারায়। প্রতিদিন এগুলোর একটা না একটা হারাতে শুরু করে। বাসায় এলে আব্বু বলে, তুমি সব ঠিকঠাক গুছিয়ে আনছ না, ইদানীং তুমি বেখেয়ালি হয়ে গেছ। আমি প্রতিদিন আরো সযত্নে ব্যাট, বল গোছাই। তবু বাসায় এসে দেখি একটা না একটা কিছু হারিয়েছে।

কিছুদিন পর অন্য মাঠে গিয়ে দেখি একটি ছেলে সবুজকে বলছে, তুমি আমার ব্যাট নিয়েছ। কিন্তু সবুজ অস্বীকার করছে। তখন মাঠের ক্যাপ্টেন এসে সবুজের ব্যাগ তল্লাশি করতেই ঐ ব্যাট পাওয়া গেল। সবুজ খুব লজ্জা পেল। ও সেদিন সারাক্ষণ চুপ করে থাকল। আমার সঙ্গেও কোনো কথা বলল না। ওর জন্য আমারও মায়া হচ্ছিল।

সবুজ মন খারাপ করে থাকলে আমার ভালো লাগত না। ওকে মাঠের সবাই কেমন যেন আলাদা করে রাখত। তা দেখে আমার কষ্ট হতো। পরে ওর বাসায় গিয়ে জানলাম ছোটোবেলায় সবুজের একটি রোগের কারণে বেখেয়ালি হয়ে অন্যের জিনিস ব্যাগে করে নিয়ে যায়। সে চুরির উদ্দেশ্যে তা করে না। সব কথা জানার পরে বন্ধুদের কাছে বুঝিয়ে বললাম। আর নিজেও বুঝতে পারলাম আমার ব্যাট ও বল হারানোর রহস্য।

এর একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। একদিন আব্বুকে বললাম, আব্বু তুমি আমার জন্য যখন ব্যাট-বল কিনবে তখন ডাবল করে কিনে দিতে পারবে? আমি আমার বন্ধুকে গিফট করব। আব্বু একটু ভেবে বলল, ঠিক আছে দেব। আমি বললাম, সুন্দর দেখে কিনবে কিন্তু।

সত্যিই আমার আব্বু আমাকে সুন্দর সুন্দর ব্যাট-বল কিনে দিলো। আমি তা থেকে এক সেট সবুজকে গিফট করলাম। সবুজ ওগুলো পেয়ে খুব খুশি হলো। অবসর সময়ে আমরা দুজন বসে গল্প করতাম। এভাবে প্রতিদিন দুজন বসে গল্প করে সময় কাটাতাম। আমার খুব ভালো লাগত। আমাদের খেলাধুলায় প্রতিযোগিতা আরো বেড়ে গেল। কিছুদিন পরে দেখা গেল, সবুজ খেলাধুলায় বেশ ভালো করছে। সবুজও ভুলে গেল অন্যের ব্যাট-বল নেওয়া। একদিন সবুজ হঠাৎ আমাকে এক সেট ব্যাট-বল গিফট করল। বলল, আমার আব্বু-আম্মুকে তোমার কথা বলেছি। আব্বু তোমার জন্য এগুলো দিয়েছে। সেদিন সবুজ খুশিতে ডগমগ হয়ে আমার হাত ধরে খেলার মাঠে নিয়ে গিয়েছিল। আমরা দুজন একটু দৌড়াদৌড়ি করে আবার এসে গল্প করতে বসলাম। আমি শুনেছি ও নাকি খুব ভালো খেলছে। মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে দেখা হয়। ও আমাকে ফিরোজ বলে ডাকত। দেখা হলে ও আমার হাত ধরে একটা ফাঁকা জায়গায় নিয়ে যায়। আমরা দুজন আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি। সবুজ বলে দেখো ফিরোজ আকাশটা কত সুন্দর, কত উদার। আমরা দুজন খিলখিল করে হেসে দুজন দুজনের বাসার পথ ধরি। ■

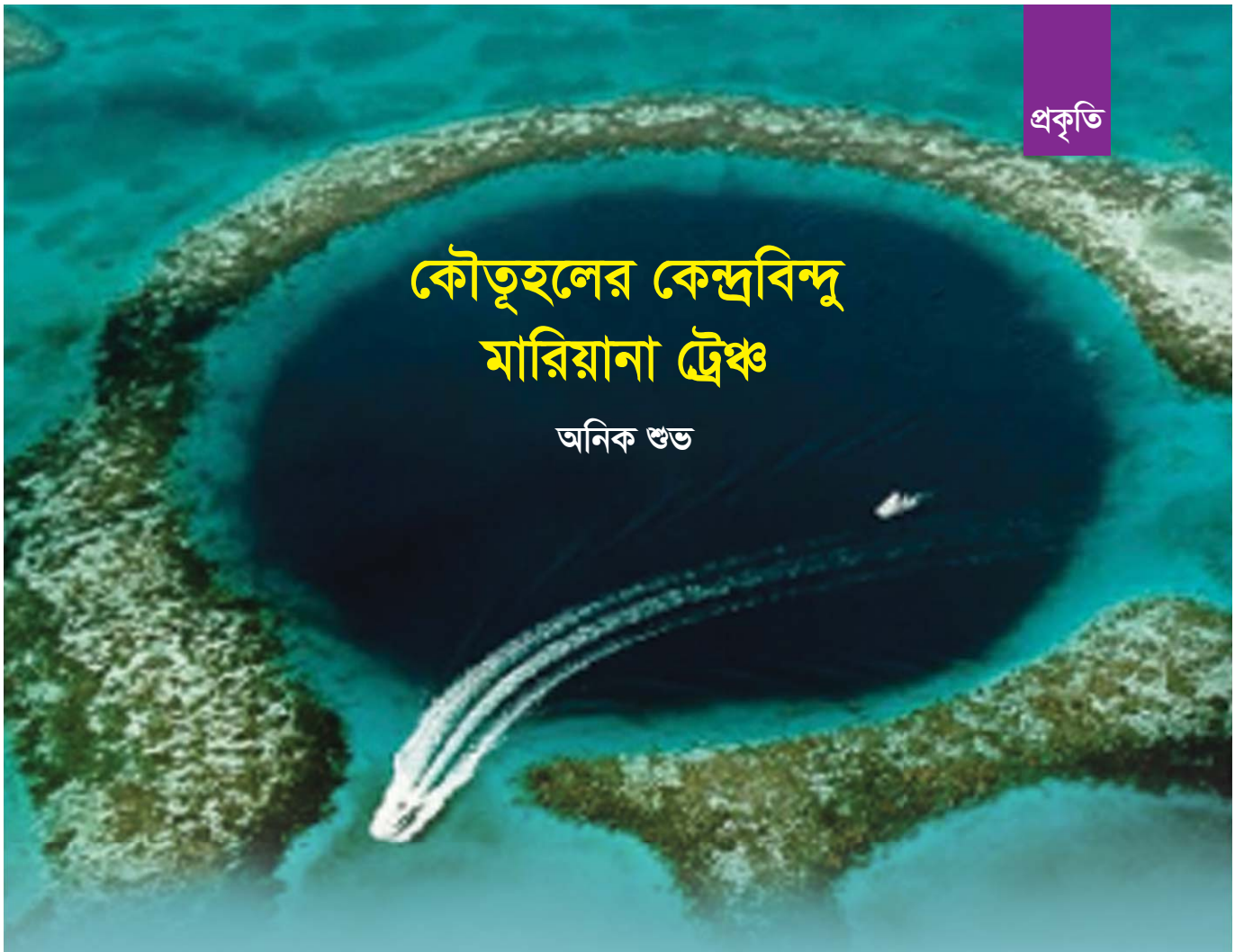

কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দু মারিয়ানা ট্রেঞ্চ

অনিক শুভ

গভীরতম গর্ত দেখলে আঁতকে ওঠা স্বাভাবিক। আর সেটা যদি হয় পৃথিবীর সবচেয়ে গভীরতম তাহলে বিষয়টা কেমন হয়? পৃথিবীর সবচেয়ে গভীরতম স্থান হলো মারিয়ানা ট্রেঞ্চ বা মারিয়ানাস ট্রেঞ্চ। বলা হয়ে থাকে চাঁদে যত জন মানুষ গিয়েছে তারচেয়ে কম মানুষ গিয়েছে মারিয়ানা ট্রেঞ্চে। এতটাই গভীর আর দুর্গম সেই স্থান। মারিয়ানা ট্রেঞ্চ প্যাসিফিক মহাসাগরে অবস্থিত। এটি সুচালো খাড়া একটি খাদ যার সর্বোচ্চ গভীরতা ১০,৯৯৮ মিটার। যদিও এই গভীরতা আরো বেশি হতে পারে বলে অনেকের ধারণা। এটি ২৫৫০ কিলোমিটার লম্বা এবং ৬৯ কিলোমিটার চওড়া।

সমুদ্র-মহাসমুদ্রের তলে এ পর্যন্ত এমন ২২টি ট্রেঞ্চের সন্ধান পেয়েছেন সমুদ্র বিজ্ঞানীরা। এর আঠারোটিই আছে প্রশান্ত মহাসাগরে। ৪.১৮৮ কিলোমিটার (১৩৭৪০ ফুট) গভীরতা নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগর হলো সবচেয়ে গভীর মহাসাগর। আর এখানে দেখতে পাওয়া অনেক ট্রেঞ্চের মধ্যে মারিয়ানাই হলো গভীরতম ট্রেঞ্চ। এই 'মারিয়ানা' কে? মারিয়ানা হলেন সতেরো শতকের স্পেনের রানি, স্পেনের রাজা চতুর্থ ফিলিপের পত্নী। ১৬৬৭ সালে স্পেনিয়াড্ররা প্রশান্ত মহাসাগরের যে দ্বীপগুলো দখল করে কলোনি প্রতিষ্ঠা করেন, রানির সম্মানার্থে তার অফিসিয়াল নামকরণ করেন 'লা মারিয়ানাস'। আর এই ট্রেঞ্চটি মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জের একদম কাছে বলে এর নামটিও হয়ে যায় 'মারিয়ানা ট্রেঞ্চ'। অন্যান্য সব ট্রেঞ্চের মতো এই মারিয়ানা ট্রেঞ্চের জন্মও হয়েছে মাটির পৃথিবীর অভ্যন্তরে সচল 'টেকটোনিক প্লেটগুলোর ধাক্কাধাক্কির ফলে। প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশে রয়েছে এরকম দু-দুটো সচল প্লেট। এর একটি 'প্যাসিফিক প্লেট'। বৈদ্যুতাকৃতির এই প্যাসিফিক প্লেটটি পশ্চিমে সরতে

সরতে ইওরেশিয়ান প্লেটের সাথে সংঘর্ষে জাপানের পূর্ব দিকে তৈরি করেছে অসংখ্য আগ্নেয়গিরিসহ ডুবন্ত পাহাড় শ্রেণির। আর দক্ষিণ-পশ্চিমে রয়েছে যে নবীন ফিলিপিন প্লেট তার সাথে সংঘর্ষে গিয়ে লজ্জায় ডুব দিয়েছে ফিলিপিন প্লেটের নিচে।

মারিয়ানা ট্রেঞ্চেরও গভীরতম অঞ্চল হলো গুয়াম দ্বীপের ২১০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত 'চ্যালেঞ্জার ডীপ'। এ পর্যন্ত মারিয়ানা ট্রেঞ্চের গভীরতা মাপতে ডিরেক্ট-ইনডিরেক্ট অনেক অভিযান চালানো হয়েছে। তবে মাত্র তিনটি সাবমার্সিবল বা ডুব জাহাজের অভিযান সফল বলে ধরা হয়। শুনতে আজব শোনালেও সত্যিই কিন্তু মারিয়ানা ট্রেঞ্চের গভীরতা মাপা হয়েছিল 'বম্বসাউন্ডিং' করে। যেখানে সাধারণ ছোটোখাটো শব্দ উৎপন্ন করে পানির গভীরতা মাপা হয়, সেখানে মারিয়ানা ট্রেঞ্চের গভীরতা মাপা হয় আধা পাউন্ডের একটি টিএনটি ব্লক ব্যবহার করে প্রতিধ্বনির মাধ্যমে। যদিও বিজ্ঞানীরা জোর গলায় বলতে পারছেন না যে এটিই আসল গভীরতা।

সবচেয়ে উত্তেজনাকর বিষয় হলো সম্প্রতি এখানে বৈদ্যুতাকার প্রাণীর উপস্থিতি টের পাওয়া গিয়েছে বিজ্ঞানীরা যাকে এলিসেলা জাইগেনশিয়া বলে নামকরণ করেছেন। যা সাধারণ এম্ফিপোডের ২০ গুণ

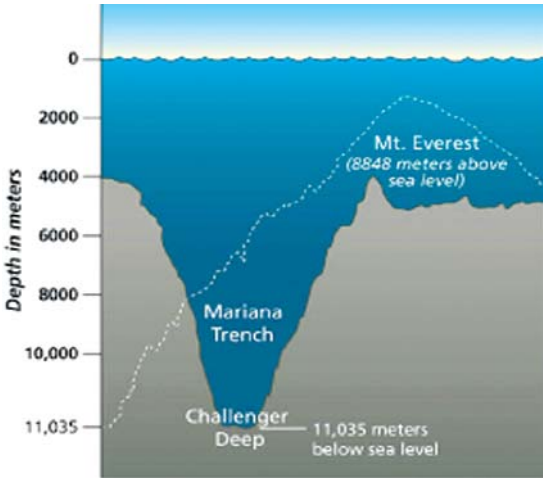

বড়ো। এই দুর্গম স্থানে প্রাণের বিকাশ গবেষকদের নতুন চিন্তার ধারা উন্মোচন করেছে। প্রবল চাপের মাঝেও জীবনের এই বিকাশ হয়ত ভবিষ্যতে মহাকাশে প্রাণের বিকাশ নিয়ে গবেষণা করতে সাহায্য করবে বলে ধারণা বিজ্ঞানীদের।

শত বছর ধরে মানুষের কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দু এই মারিয়ানা ট্রেঞ্চ। কত রহস্য, কত অজানা এই ট্রেঞ্চকে ঘিরে। রহস্যের নেই কোনো শেষ, আছে মৃত্যুর হাতছানি– তবুও রহস্যপ্রিয় মানুষের কাছে চির আপন। ■

সহস্রাব্দী শাখাওয়াত, দশম শ্রেণি, কিডস কালচার ইনস্টিটিউট

থ্রিডি প্রিন্টার যেন জাদু জানে!

সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

হাতের হাড় ভেঙে গেছে? অথবা মাথার খুলি গেছে ফেটে? একদম চিন্তা নেই, প্রিন্টারেই প্রিন্ট করে নিতে পারো হাড়গোড় কিংবা খুলির অংশ। অথবা দরকার আস্ত একটা গাড়ি, যা দেশে পাওয়া যায় না? প্রিন্ট দিয়ে দাও, প্রিন্টার থেকেই বেরিয়ে আসবে গাড়ির নানা অংশ। কী বন্ধুরা অবাক হয়ে যাচ্ছ? মনে হচ্ছে আমি কোনো জাদুর কথা বলছি? না, আসলে তা নয়, আমি থ্রিডি প্রিন্টারের কথা বলছি। তোমরা নিশ্চয়ই থ্রিডি প্রিন্টারের নাম শুনেছ। এসো থ্রিডি প্রিন্টার সম্পর্কে আমরা কিছু জেনে নেই।

বর্তমান প্রযুক্তির জগতে সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী হলো থ্রিডি প্রিন্টার প্রযুক্তি। সাধারণত প্রিন্টার বলতে আমরা কাগজ ও কালির ব্যবহার বুঝি। থ্রিডি প্রিন্টিং পদ্ধতি সেই ধারণাকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। এই প্রিন্টারের জন্য ব্যবহার করা হয় প্লাস্টিক পলিমার। এটি কোনো জিনিসকে কাগজের ওপর প্রিন্ট না করে সম্পূর্ণ বস্তুটি বাস্তবে তৈরি করে ফেলতে পারে। এই প্রিন্টার সাধারণত ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ত্রিমাত্রিক মুদ্রণের কাজ করে। যেমন তুমি সাধারণ প্রিন্টারে তোমার একটি ছবি তুলে সেটি একটি কাগজে ২ডি সারফেসে প্রিন্ট করে আনতে পারো। কিন্তু থ্রিডি প্রিন্টার তোমার সেই ছবিটির বাস্তব রূপটিই বের করে দেবে। থ্রিডি প্রিন্টারের ৩টি অংশ আছে - মেশিন প্রোপার, কম্পিউটার এবং ত্রিমাত্রিক ছবি তোলার জন্য একটি ক্যামেরা বা স্ক্যানার। অর্থাৎ থ্রিডি প্রিন্টার হলো এমন একটি প্রযুক্তি যাতে কাগজ বা কালির ব্যবহার নেই। এটি কোনো জিনিসকে কাগজের ওপর প্রিন্ট না করে সম্পূর্ণ বস্তুটি হুবহু বাস্তবে তৈরি করে ফেলতে পারে!

বাংলাদেশেও দিন দিন জনপ্রিয়তা পাচ্ছে থ্রিডি প্রিন্টিং প্রযুক্তি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি কিছু কিছু সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও প্রোটোটাইপ তৈরির জন্য থ্রিডি প্রিন্টিং-এর সাহায্য নিচ্ছে। আমাদের দেশেই এখন পাওয়া যাচ্ছে থ্রিডি প্রিন্টার ও থ্রিডি প্রিন্টিং প্রযুক্তি সেবা। এই থ্রিডি প্রিন্টার বিপণন করছে টেকনোনিডস নামের তরুণ উদ্যোক্তাদের একটি প্রতিষ্ঠান। টেকনোনিডস থ্রিডি প্রিন্টার বিক্রির পাশাপাশি থ্রিডি প্রিন্টিং সেবাও দেয়।

থ্রিডি প্রিন্টার প্রিন্টিং খাতে বিপ্লব এনেছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে থ্রিডি প্রযুক্তির ব্যবহার নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। গবেষণা চলছে মানবদেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের জটিল গঠনের আদলে কৃত্রিম অঙ্গ তৈরির। হাসপাতালেও আর প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশের অভাবে চিকিৎসা থেমে থাকবে না। দুর্ঘটনায় হাত-পা হারানো কারো দরকার কৃত্রিম হাত-পা? PRINT PRINT PRINT। সায়েন্স ফিকশনের মতো শোনালেও এটা আজ রূপ নিয়েছে বাস্তবে। এই প্রিন্টিং প্রযুক্তির তৈরি বাড়িঘরেও মানুষ বসবাস করতে যাচ্ছে অচিরেই। কী অবিশ্বাস্য তাই না? কি না তৈরি করা যায় এই প্রিন্টারে। খেলনা, কৃত্রিম অঙ্গ, গাড়ি, হ্যাট, জুতা, কৃত্রিম বার্গার, কার সিট, বাইক, মানুষের সংস্করণ, বন্দুক আরো কত কী!

থ্রিডি প্রিন্টিং-এর কাজ যেন জাদুর মতো, তাই না বন্ধুরা! জাদু মনে হলেও থ্রিডি প্রিন্টিং আজ মানুষের জীবনে আশ্চর্যজনক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে। বদলে যাচ্ছে এই পৃথিবী। আস্তে আস্তে বা অন্যভাবে বললে খুব দ্রুত। ■

দুর্যোগ প্রতিরোধ

আগুন লাগলে কী করবে

শাহানা আফরোজ

বন্ধুরা তোমরা তো জানো আগুন আমাদের জীবনের সবচেয়ে দরকারি উপাদান। কিন্তু এই আগুনই কখনো কখনো আমাদের জীবন নাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এলোমেলো করে দেয় আমাদের সাজানো গোছানো জীবন। আমরা যেখানেই থাকি না কেন সেখানে হঠাৎ আগুন লেগে যেতে পারে। আগুন লাগলে তাড়াহুড়ায় অনেকেই ভুল সিদ্ধান্ত নেয়। যার মাশুল দিতে হয় বেশ কঠিনভাবে। আগুন থেকে বাঁচতে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হলো সতর্কতা। আগুন লাগার পরে তাৎক্ষণিকভাবে সবাই বুঝে উঠতে পারে না কী করতে হবে। এসময় ভয় না পেয়ে শান্ত হয়ে ভেবে নিতে হবে কি করা যায়। এসো জেনে নেই কিছু সতর্কতা ও করণীয়ঃ

* আগুন কোথায় লেগেছে এবং আসলেই লেগেছে কিনা তা বোঝার চেষ্টা করতে হবে। আগুন ছোটো থাকতেই অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার করে তা নিভিয়ে ফেলতে হবে।
* আগুন যদি বৈদ্যুতিক বা রাসায়নিক দ্রব্য থেকে না লেগে থাকে তাহলে সেটা নেভানোর জন্য পানি ব্যবহার করা যেতে পারে।
* জিনিস বাঁচাতে গিয়ে সময় নষ্ট করা যাবে না। জিনিসের চেয়ে জীবন দামি।
* দেরি না করে নিকটস্থ ফায়ার স্টেশনে সংবাদ দিতে হবে অথবা কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষে (০২-৯৫৫৫৫৫৫/০১৭৩০৩৩৬৬৯৯) জানাতে হবে। অথবা পরিসেবা ৯৯৯-এ কল করতে হবে।
* কাপড়ে আগুন লেগে গেলে দৌড়ানো যাবে না। দুই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে গড়াগড়ি করতে হবে অথ বা মোটা কম্বল বা কাঁথা দিয়ে চেপে ধরতে হবে।
* বাতাসের তুলনায় ধোঁয়ার ঘনত্ব কম। তাই আগুনের ধোঁয়া উপরের দিকে ওঠে। এক্ষেত্রে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসতে হবে তবে মাথা মেঝে থেকে ৩০-৩৬ ইঞ্চি উপরে রাখতে হবে।
* ভবন উঁচু হলে লাফ না দিয়ে খোলা জায়গা খুঁজতে হবে।

* ঘরের দরজা খোলার আগে দরজা গরম কিনা পরীক্ষা করতে হবে যদি গরম হয় তবে বুঝতে হবে ওপাশে আগুন আছে।
* ঘরের মধ্যে বন্দি হয়ে পড়লে ডাস্টটেপ, ভেজা তোয়ালে বা কাপড় দিয়ে আসপাশের সব ফাঁকা জায়গায় বাতাস চলাচলের পথ বন্ধ করে দিতে হবে।
* নিচে নামতে না পারলে ছাদে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।
* জানালার কাচ হাত দিয়ে নয় শক্ত কোনো কিছু দিয়ে ভাঙতে হবে।
* জানালা বা ফাঁকা কোনো জায়গা দিয়ে কাপড় বা টর্চ জ্বালিয়ে সংকেত দিতে হবে যেন উদ্ধার কর্মীদের নজরে পড়ে।

এরকম কিছু পদক্ষেপ বাঁচিয়ে দিতে পারে আমাদের মূল্যবান জীবন। তবে মনে রাখতে হবে বিপদে শান্ত থাকতে হবে। একটু বুদ্ধি খাটালেই বের হওয়ার পথ পাওয়া যাবে।

সম্প্রতি অগ্নিকাণ্ডের দু-একটি দুর্ঘটনা আমাদের সবাইকে হতবিহ্বল করেছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও এ বিষয়টি নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন। তাই তো মন্ত্রীসভার নিয়মিত বৈঠকে অগ্নিকাণ্ড রোধ এবং ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে দিয়েছেন পনেরোটি নির্দেশনা। নির্দেশনাগুলো হলো-

১. বহুতল ভবন তৈরি করার ক্ষেত্রে ফায়ার সার্ভিস সাধারণত একটি ক্লিয়ারেন্স দেয় সেক্ষেত্রে এখন ক্লিয়ারেন্সই যথেষ্ট নয় এটি পরিদর্শন করে এখানে বহুতল ভবন নির্মাণযোগ্য কি না তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

২. ফায়ার সেফটির বিষয়টি নিয়মিত অনুসন্ধান করা এবং শিল্প-কারখানার মতো প্রতিবছর এটি নবায়ন করা যায় কিনা, বছর বছর তা দেখা।

৩. বিল্ডিং কোড অনুসরণ করা।

৪. নিয়মিত ফায়ার ড্রিল করা (অগ্নিনির্বাপক মহড়া করা), যেটি প্রতি তিনমাসে একবার হতে পারে।

৫. অগ্নিকাণ্ডের ক্ষেত্রে দেখা যায় ধোঁয়াতেই অধিকাংশ মানুষ শ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যায়। কাজেই পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এই স্মোক কন্ট্রোলের যে ব্যবস্থা রয়েছে তা অনুসরণ করা।

৬. আগুন লাগলে পানির অভাব দূর করার জন্য রাজধানীর যেখানে যেখানে সম্ভব জলাশয় বা জলাধার তৈরি করা।

৭. রাজধানীর ধানমন্ডি, গুলশানসহ এখানে যেসব লেক রয়েছে সেগুলো সংরক্ষণ করা।

৮. বাংলাদেশে আগুন লাগলে ৩০ তলা পর্যন্ত যাওয়ার জন্য বর্তমানে তিনটি সুউচ্চ মই (ল্যাডার) রয়েছে। এই সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৯. ভবন নির্মাণের সময় স্থপতিরা যেন আমাদের পরিবেশ এবং বাস্তবতার নিরিখে বহুতল ভবনের নকশা প্রণয়ন করে। বর্তমানের ম্যাচ বক্সের আদলে দরজা-জানালা বক্স করে পুরো কাচ ঘেরা দিয়ে কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ভবন করা হচ্ছে। সেভাবে না করে বারান্দা বা জানালা নির্মাণ করা। যেন কোনো বিপদ ঘটলেও শ্বাস নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা থাকে।

১০. ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে শতভাগ ফায়ার এক্সিট নিশ্চিত করা।

১১. ইলেক্ট্রিক সিস্টেম ডোর ফায়ার এক্সিট থাকবে না, সেগুলো ওপেন দরজা এবং ম্যানুয়ালি নিয়ন্ত্রিত হতে হবে।

১২. দমকল বাহিনীর সেফটি গিয়ারে তারপলিন সিস্টেম এবং নেট সিস্টেম অন্তর্ভুক্ত করা। যাতে কোথাও আগুন লাগলে মানুষ তার মাধ্যমে ঝুলে ঝুলে নামতে পারে।

১৩. হাসপাতাল এবং স্কুলগুলোতে রুমের বাইরে বারান্দা বা খোলা জায়গা রাখা। ইন্টেরিয়র ডিজাইনাররা অনেক সময় এগুলো ব্লক করে দেয়, কাজেই সেটা যেন না হয়।

১৪. আগুনের সময় যেন লিফট ব্যবহার না করা, এজন্য সচেতনতা সৃষ্টিতে প্রশিক্ষণ প্রদান। এবং

১৫. প্রতিটি ভবনে কম করে হলেও দুটি এক্সিট পয়েন্ট যেন থাকে।

সব বিভাগে অটিজম পরিচর্যা কেন্দ্র

তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

দেশের সব বিভাগীয় শহরে অটিজম পরিচর্যা কেন্দ্র করার ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পিতামাতা ও অভিভাবকহীন নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী মেয়েদের জন্য সরকার ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও বগুড়ায় ৫০ আসনের পরিচর্যা কেন্দ্র স্থাপন করেছে। পর্যায়ক্রমে দেশের আটটি বিভাগীয় শহরে বড়ো পরিসরে এ ধরনের পরিচর্যা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। এসব কেন্দ্রে তাদের শিক্ষা, চিকিৎসা, বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং খেলাধুলাসহ সব সুযোগ সুবিধা থাকবে- বলেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রতিবন্ধী সন্তানের জন্য মাকে দায়ী করবেন না

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার আহ্বান জানানোর পাশাপাশি সন্তান প্রতিবন্ধী হলে অযথা মাকে দোষারোপ না করতেও দেশবাসীর প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, একটা শিশু যখন জন্ম নেয় তখন শিশুটি অটিস্টিক হবে কী না তা বাবা-মা কারো জানার বা বোঝার কথা নয়। এজন্য বাবা-মা কেউ দায়ী নয়। এটা সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছা।

দেশের সব প্রতিবন্ধী ভাতা পাবে

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর কল্যাণে সরকারের পদক্ষেপসমূহ তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'সরকার আগামী বাজেট থেকে দেশের সব প্রতিবন্ধীকে ভাতা দেবে।' ১২তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উপলক্ষ্যে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি একথা বলেন। বর্তমানে দেশের ১০ লাখ প্রতিবন্ধীকে সরকার ৭০০ টাকা করে মাসিক ভাতা দিচ্ছে। সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী দেশে এখন ১৪ লাখ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী রয়েছে। আগামী বাজেট থেকে তারাও ভাতার আওতায় আসবে। অটিজমে আক্রান্ত শিশুরা সাধারণত কোনো একটি

বিশেষ ক্ষেত্রে পারদর্শী হয়। তারা সঠিক পরিচর্যা পেলে স্বাভাবিকভাবে সবার সঙ্গে মিলে চলতে পারবে। প্রতিবন্ধীদের মেধাকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, এ অবহেলিত জনগোষ্ঠী যেন আর অবহেলার শিকার না হয়। তারা যেন আমাদের সমাজে তাদের যোগ্য স্থান পায়। কারণ তারা আমাদেরই সন্তান, আমাদেরই ভাইবোন, সে কথাটা মনে করে সবাই অটিস্টিক বা প্রতিবন্ধীদের সাথে নিয়ে চলবে সেটাই আমি চাচ্ছি।

বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন শিশুদের নাটক

সব শিশুই যেমন সময় সুযোগ পেলে নিজেদের প্রতিভা বিকাশ করতে পারে তেমনি বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন শিশুরাও পারে। স্নায়ুবিক প্রতিবন্ধীতায় আক্রান্ত শিশুদের পরিবেশিত নাটক মহিলা সমিতি মঞ্চে দেখে দর্শকরা মুগ্ধ। ৮ই এপ্রিল ১২তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতামূলক দিবস উপলক্ষ্যে কারিশমা সাংস্কৃতিক দলের মঞ্চ নাটক 'মানচিত্রের জন্য' মঞ্চায়ন করে তারা। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, বিশেষ অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদসহ আরো অনেক গুণিজন।

প্রতিবন্ধীদের তৈরি কার্পেট বিদেশে

শারীরিক প্রতিবন্ধীতা জয় করেছেন ময়মনসিংহের মহিলা ক্লাবের কার্পেট ও হস্তশিল্প কারখানায় কর্মরত শতাধিক প্রতিবন্ধী নারী। তারা সবাই কার্পেট তৈরির কাজ করে হয়েছেন স্বাবলম্বী। তাদের তৈরি কার্পেট এখন দেশের সীমানা ছাড়িয়ে জাপান, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানিসহ বেশ কয়েকটি দেশে। প্রথমে তারা স্থানীয় বাজারের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ করতেন। তাদের উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান ভালো হওয়ায় তা বর্তমানে বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। ■

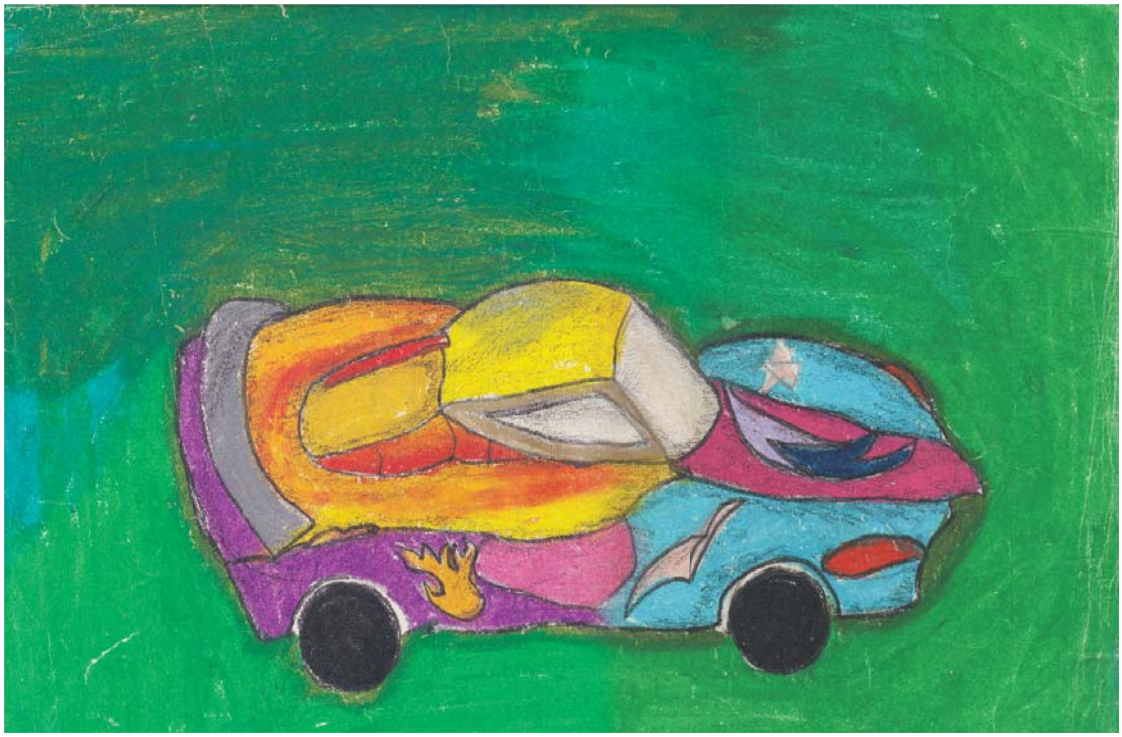

মো. সাজিদ হোসেন, সপ্তম শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বনশ্রী, ঢাকা

স্বাস্থ্য প্রতিবেদন

উচ্চতা বাড়াবে ব্যায়াম

মো. জামাল উদ্দিন

বয়স বাড়ছে কিন্তু বাড়ছে না উচ্চতা। এমনটা হলে দুশ্চিন্তার শেষ থাকে না। লম্বা হওয়ার জন্য তখন কতই না চেষ্টা। হা-হুতাশেরও শেষ নেই। ইস! আর একটু যদি লম্বা হতে পারতাম। অথচ সহজ কিছু ব্যায়াম করে নিজের উচ্চতা বাড়িয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু সে সময়টা কোথায়। আজকাল তো ছেলে-মেয়েরা সাধারণত ব্যায়ামের সময় পায় না। একটার পর একটা ব্যস্ততা তাদের ঘিরে রাখে। স্কুলের পড়াশোনা, বাড়ির কাজ আর টেলিভিশন বা কম্পিউটার গেমস নিয়ে সময় কেটে যায়। এর পরও দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। কেননা লম্বা হওয়ার ব্যায়ামের জন্য বাড়তি কোনো সময়ের প্রয়োজন নেই। পড়াশোনার মধ্যেও হালকা ব্যায়ামে নিজের উচ্চতার উন্নতি করা যায়।

এক পায়ে লাফ পদ্ধতি

এটা সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি। যে-কোনো সময় এবং যে-কোনো স্থানে এটি সহজে করা যায়। প্রয়োজন নেই কোনো নির্দিষ্ট জায়গার। ঘরে বা বাইরে যে-কোনো স্থানে এই ব্যায়ামটি করা যেতে পারে। এমনকি পড়াশোনার সময়ও। পর্যাপ্ত সময় না পাওয়া গেলে কোথাও যাওয়ার পথেও সেরে নেওয়া যায় ব্যায়ামটি। পড়াশোনা তৈরি কিংবা খেলাধুলার সময় একটু মনে করেই ব্যায়ামটি করা যায়। দুই হাত আকাশের দিকে রেখে এক পায়ে লাফাতে হবে। অন্তত ৮ বা ১০ পদক্ষেপ এক পায়ে লাফাতে হবে। এবার অন্য পায়ে এটি করতে হবে। নিয়মিত এ ব্যায়াম করলে দারুণ ফল পাওয়া যাবে। ব্রেনের উপকার হয়। এটা পায়ের শক্তি যেমন বাড়ায় তেমনি উচ্চতা বৃদ্ধির হরমোনকে প্রভাবিত করে।

ঝোলা ব্যায়াম

একটা রড বা কোনো কিছু ধরে ঝুলতে হবে। এ সময়ে পায়ের আঙুল মাটির দিকে এবং মুখ ওপরে রাখতে হবে। এই ব্যায়াম উচ্চতা বাড়াতে সাহায্য করে এবং হাত ও কাঁধ শক্তিশালী করে। এছাড়া হজম শক্তিও বৃদ্ধি করে। ■

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

এ মাসের শব্দ ধাঁধা

শব্দ ধাঁধা

পাশাপাশি:১. ক্ষতিসাধন, ৩. নয়নাভিরাম, ৪.মতভেদ, ৬. অসৎ, ৮. প্রতিজ্ঞা, ১০. আস্কারা

উপর-নিচ: ১. অসংখ্য, ২. ভোলা জেলার একটি উপজেলা, ৩. প্রতিশোধ, ৫.বিশ, ৭. বিবাহ, ৯. পোকা

	১						
						২	
				৩			
৪		৫					
					৬		৭
		৮	৯				
					১০		

এ মাসের ব্রেইন ইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

৯	/		+	১	=	
-		*		+		+
	*	২	-		=	৩
/		-		-		+
২	+		-	২	=	
=		=		=		=
	+	৫	-		=	৮

গত সংখ্যার শব্দ ধাঁধার সমাধান:

কা	ন		ম				
	বা	তা	য়	ন			ম
নি	ব		দা				স
	জা		ন	খ	দ	র্প	ন
দা	দা				প্ত	*	দ
না			গা	জ	র		
দা				টি			
র	সু	ন		ল	ট	ক	ন

গত সংখ্যার ব্রেইন ইকুয়েশনের সমাধান:

৮	*	২	-	৭	=	৯
-		*		+		+
৫	*	৩	-	৬	=	৯
+		-		-		+
৩	+	৪	-	৫	=	২
=		=		=		=
৬	*	২	+	৮	=	২০

ছক মিলাও

ছকে যেসব শব্দ বসিয়ে মেলাতে হবে, তা নিচে সংকেতের পাশে দেওয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে একটি ঘর পূরণ করে দেওয়া হলো।

সংকেত: নগরপিতা, অষ্টব্যঞ্জন, অলস, চেয়ার, অষ্টম, আহার, হাসি, মনোরম, কলরব, বট

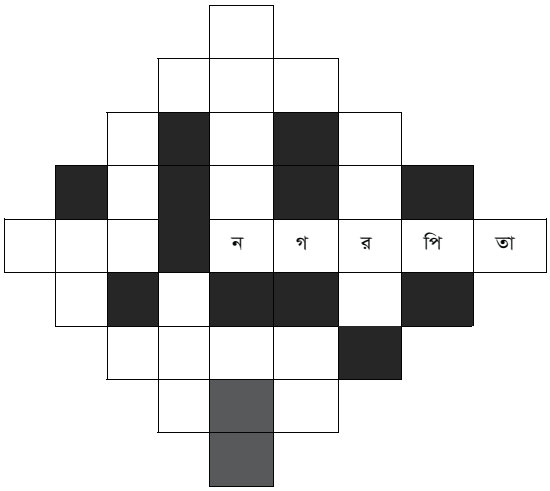

গত সংখ্যার সমাধান:

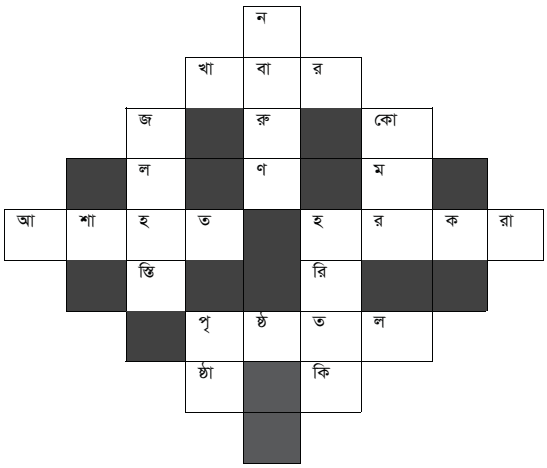

নাম্ব্রিক্স

নিচের ছকটির নাম নাম্ব্রিক্স। ১-৮১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে ছকটিতে প্রতিটি সংখ্যা একবার করে বসাতে হবে। সংখ্যাগুলোকে ক্রমিকভাবে বসাতে হবে। বসানোর সময় পরের সংখ্যা পাশাপাশি বা উপরে-নিচে আকারে বসবে, কোনাকুনি বসানো যাবে না।

গত সংখ্যার সমাধান:

৭৭		৭৫		৪১	৩২			২৯
	৮১					৩৪		
৭৯					৩৮		২৬	
৭০		৭২	৪৫			৩৬		২৪
		৬৫			১৬		২২	
৬৮			৬৩			১৮		২০
	৫৮		৫০	৪৯		১		৩
	৫৯	৬০			১৩	৮	৭	
৫৫		৫৩		১১			৬	

গত সংখ্যার সমাধান:

৬৩	৬৪	৭৩	৭৪	৭৭	৭৮	৭	৮	৯
৬২	৬৫	৭২	৭৫	৭৬	৭৯	৬	১১	১০
৬১	৬৬	৭১	৭০	৮১	৮০	৫	১২	১৩
৬০	৬৭	৬৮	৬৯	২	৩	৪	১৫	১৪
৫৯	৫৬	৫৫	৫৪	১	৩৪	৩৩	১৬	১৭
৫৮	৫৭	৫২	৫৩	৩৬	৩৫	৩২	৩১	১৮
৪৭	৪৮	৫১	৩৮	৩৭	২৮	২৯	৩০	১৯
৪৬	৪৯	৫০	৩৯	৪০	২৭	২৪	২৩	২০
৪৫	৪৪	৪৩	৪২	৪১	২৬	২৫	২২	২১

সঠিক উত্তর পাঠিয়ে দাও এই ঠিকানায়:

সম্পাদক, নবারুণ
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০।
ইমেইল: editornobarun@dfp.gov.bd